বেদেনী

র এ মেলায় প্রতি বৎসর আসে। তাহার বসিবার স্থানটা মা ষ্টের খাতায় চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের মত কায়েমী হইয়া গিয়াছে। , বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে, 'ভোজবাজি—ছারকাছ'। ছোট শপথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও 'ভোজবাজি—সার্কাস'। লেখাটার এক পাশে একটা বাঘের শে একটা মানুষ, তাহার হাতে এক রক্তাক্ত তলোয়ার, অপর ছিন্নমুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুই পয়সা। ভোজবাজি অর্থে , খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দ্দায় শম্ভু মোটা দেয়, পল্লীবাসীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়া দেখে কের যুদ্ধ', দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়' 'তাজবিবিকা র শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্ব্বশেষে একটা পর্দ্দা খাঁচায় বন্দী একটা চিতাবাঘ। বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া মুখোমুখী টাকে চুমা খায়, সর্ব্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয়, মাথাটাই বাঘের মুখের দিল। সরল পল্লীবাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া খিতে করতালি দিয়া উঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়, ল বাহির হইয়া যায়, সর্ব্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাকটা পিটিতে থাকে—দুম, দুম, দুম।

জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রাধিকা বেদেনী প্রকাণ্ড একজোড়া কর চাপিয়া ধরিল, ঝন-ঝন-ঝন।

...ছি।

...পিয়া ধরিল,

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে,—বড় বাঘ! ওই বড় বা-ঘ।

বেদেনী প্রশ্ন করে,—বড় বাঘ কি করে?

—পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের চুমা খায়, জ্যান্ত মানুষের মাথা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলো শেষ করিয়াই সে ভিতরে গিয়া বাঘটাকে একটা তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশ দিয়া খোঁচা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা বার বার গর্জ্জন করিতে থাকে। তাঁবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিপূর্ণ কৌতূহলকম্পিত বক্ষে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এ ছাড়াও বেদেনীর নিজের খেলা আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর আর গোটাকতক সাপ। সকাল হইতে সে আপনার ঝুলি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জ্জন করিয়া আনে!

•

এবার শম্ভু কঙ্কালীর মেলায় আসিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আর একটা বাজির তাঁবু আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুটা অনেক বড় এবং কায়দাকরণেও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহিরে দুইটা ঘোড়া, একটা গরুর গাড়ির উপর প্রকাণ্ড একটা খাঁচা রহিয়াছে, নিশ্চয় উহাতে বাঘ আছে!

গরুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে মর্ম্মান্তিক ঘৃণায় হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, আক্রোশভরা নিম্নকণ্ঠে বলিল, শালা!

কথা সত্য, ...ীষণ হইয়া উঠিল। শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর লুকাইয়া চো... ন ...খানো আছে। ক্রুর নিষ্ঠুরতাপরিব্যঞ্জক একধারার উগ্র কখনও ছা... াছে —শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে; আকৃতি দীর্ঘ, সর্ব্বাঙ্গে সাধারণ ... ন কঠোরতা, মুখে কপালের নীচেই নাকে একটা খাঁজ, সাপের ...ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সে দন্তুর, সম্মুখের দুইটা দাঁত কেমন বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে। হিংসায়, ক্রোধে সে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রাধিকাও হিংসায় ক্রোধে, ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে চকমক করিয়া উঠে, তেমনই ঝকমক করিয়া উঠিল; সে বলিল,—দাঁড়া, বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁকা ছেড়্যা!

রাধিকার উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নূতন তাঁবুটার ভিতর ঢুকিয়া বলিল, কে বেটে, মালিক কে বেটে?

—কি চাই?—তাঁবুর ভিতরের আর একটা ঘরের পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি জোয়ান পুরুষ ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি এক...বটি সবল এবং দৃঢ় কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; লম্বা অঙ্গে...,—'তাজী' ঘোড়ার যেমন একটা মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে—লোকটির হাল্কা অথচ সবল দৃঢ় শরীরে তেমনই একটি লাবণ্য আছে। রং কালোই, নাকটি লম্বা টিকোলো, চোখ দুইটি সাধারণ, পাতলা ঠোঁট দুইটির উপর তুলি দিয়া আঁকা গোঁফের মত এক জোড়া গোঁফ সূচ্যগ্র করিয়া পাক দে...া, মাথায় বাবরি চুল, গলায় কারে ঝুলানো একটি সোনার ছোট চৌকা তক্তি;—সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। দুইজনেই দুইজনকে দেখিতেছিল।

কি চাই?—নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল, কথার সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে শম্ভুর নাকের নীচে বায়ুস্তর ভুরভুর করিয়া উঠিল।

শম্ভু খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল,—এ জায়গা আমার। আমি আজ পাঁচ বৎসর এইখানে আছি।

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডানহাতে শম্ভুর বাঁ হাত চাপিয়া ধরিল, মাতালের হাসি হাসিল, বলিল, সে হবে, আগে মদ খাও টুক্‌চা।

শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রে দ্রুততম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল. রাধিকা কখন আসিয়া শম্ভুর পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল,—কটি বোতল আছে তুমার নাগর—মদ খাওয়াইবা ?

ছোকরাটি শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চাহিয়া রাধিকাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহে কথা হারাইয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। কালো সাপিনীর মত ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্ব্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা ; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সূতার মত সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্দ্ধনিমীলিত ভঙ্গির মদিরদৃষ্টি দুটি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে—সর্ব্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে সদ্য স্নান করিয়া উঠিল ; মাদকতা তাহার সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়াফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় একটা নেশা। শুধু রাধিকারই নয়, এই বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত রূপবৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য রাধিকার রূপের একটা প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে ; কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের মত ধারের ইঙ্গিত, চারিত্রিক হিংস্র তীক্ষ্ণ উগ্রতার আভাস, মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয় ; ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

রাধিকার খিল খিল হাসি থামে নাই, সে নূতন বাজিকরের বিস্ময়বিহ্বল নীরব অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল, বাক হর‍্যা গেল যে নাগরের ?

বাজিকর এবার হাসিয়া বলিল, বেদের বাচ্চা গো আমি। বেদের ঘরে মদের অভাব ! এস।

কথা সত্য, এই অদ্ভুত জাতটি মদ কখনও কিনিয়া খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, ধরাও পড়ে, জেলেও যায়, কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখনও ছাড়ে না। শাসন-বিভাগের নিকট পর্য্যন্ত ইহাদের এ অপরাধটা অতি সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শম্ভুর বুকখানা নিশ্বাসে ভরিয়া এতখানি হইয়া উঠিল। আহ্বানকারীও তাহার স্বজাতি, নতুবা—। সে রাধিকার দিকে ফিরিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল;—তুই আইলি কেনে এখেনে ?

রাধিকা এবারও খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল,—মরণ তুমার! আমি মদ খাব নাই।

তাঁবুর ভিতরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে মদের আড্ডা বসিল। চারিদিকে পাখীর মাংসের টুকরা টুকরা হাড়ের কুচি ও একরাশি মুড়ি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; একটা পাতায় এখনও খানিকটা মাংস, আর একটায় কতকগুলা মুড়ি, পেঁয়াজ, লঙ্কা, খানিকটা নুন; দুইটী খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্দ্ধসমাপ্ত। বিস্রস্তবাসা একটী বেদের মেয়ে পাশেই নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, মাথার চুল ধূলায় রুক্ষ, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া ঊর্দ্ধবাহুর ভঙ্গিতে মাটির উপর লুণ্ঠিত, মুখে তখনও মদের ফেনা বুদ্বুদের মত লাগিয়া রহিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটি।

রাধিকা তাহাকে দেখিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল! বলিল, —তুমার বেদেনী ? ই যি কাটা কলাগাছের পারা পড়েছে গো!

নূতন বাজিকর হাসিল, তারপর সে স্খলিতপদে খানিকটা অগ্রসর হইয়া একটা স্থানের আল্‌গা মাটি সরাইয়া দুইটা বোতল বাহির করিয়া আনিল।

মদ খাইতে খাইতে কথা যাহা বলিবার বলিতেছিল নূতন বাজিকর আর রাধিকা।

শম্ভু মত্ততার মধ্যেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। প্রথম পাত্র পান করিয়াই রাধিকা বলিল,—কি নাম গো তুমার বাজিকর?

নূতন বাজিকর কাঁচা লঙ্কা খানিকটা দাঁতে কাটিয়া বলিল,—নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

—কেনে?

—নাম বটে কিষ্টো বেদে।

—তা গালি দিব কেনে?

—তুমার নাম যে রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই সে আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষিপ্র হস্তে কি বাহির করিয়া নূতন বাজিকরের, গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল,—কই, কালিয়দমন কর দেখি কিষ্টো, দেখি!

শম্ভু চঞ্চল হইয়া পড়িল; কিন্তু কিষ্টো বেদে ক্ষিপ্র হাতে আঘাত করিয়া সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কালো কেউটের বাচ্চা! আহত সর্পশিশু হিস্ হিস্ গর্জ্জনে মুহূর্ত্তে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়া উঠিল; শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল, 'আ-কামা'! অর্থাৎ বিষদাঁত এখনও ভাঙা হয় নাই। কিষ্টো কিন্তু ততক্ষণে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে ডান হাতে ট্যাঁক হইতে ছোট একটা ছুরি বাহির করিয়া দাঁত দিয়া খুলিয়া ফেলিল এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুই কাটিয়া ফেলিয়া রাধিকার গায়ে আবার ছুঁড়িয়া দিল। রাধিকাও বাঁ হাতে সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগে সে মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বের ওই সাপটার মতই ফুলিয়া উঠিল, বলিল,—আমার সাপ তুমি কামাইলা কেনে?

কিষ্টো বলিল,—তুমি যে বল্ল্যা গো দমন করতে।—বলিয়া সে এবার হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাধিকা মুহূর্ত্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই।

নূতন তাঁবুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে মাচা বাঁধিয়া সেটার উপর বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জালিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাধিকা আপনাদের ছোট তাঁবুটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের খেলার তাঁবু এখনও খাটানো হয় নাই। রাধিকার চোখ দুইটি হিংস্রভাবে যেন জ্বলিতেছিল।

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল; আরও একটু দূরে একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কিষ্টো। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে। তবে ধর্ম্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু. মনসা-পূজা করে, মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু পুরাণ-কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। এমনই আর একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দু-পুরাণ-গান করে, তাহারা নিজেদের বলে পটুয়া, নিপুণ চিত্রকরের জাতি। বিবাহ আদান প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামীয় পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়। জীবিকায় বাজিকরেরা সাপ ধরে, সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়, অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ লইয়া খেলা দেখায়। কিন্তু এই নূতন তাঁবুর মতো সমারোহ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কখনও খেলা দেখায় নাই। রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া সে বাঘটাকে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকচকে চিক্কণ লোম, মুখে হাসির মত ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে! আর তাহাদের বাঘটা স্থবির শিথিলদেহ; অতি কর্কশ, খসখসে

লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠে। কতবার সে শম্ভুকে বলিয়াছে একটা নূতন বাঘ কিনিবার জন্য, কিন্তু শম্ভুর কি যে মমতা ঐ বাঘটার প্রতি, তাহার হেতু সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না।

নামাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিতেই সে গভীর ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, তুর ওই বুড়া বাঘের খেলা কেউ দেখতে আসবে নাই।

ক্রুদ্ধস্বরে শম্ভু বলিল, তু জানছিস সব!

রাধিকা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না জেনে না আমি! তু-ই জানছিস সব!

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রাধিকা থামিল না, কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল,—ওরে মড়া, বুড়ার নাচন দেখতে কার কবে ভাল লাগে রে? আমারে বলে, তু জানছিস সব!

শম্ভু মুহূর্ত্তে ক্ষিপ্র হইয়া উঠিল, পরিপূর্ণভাবে তাহার হিংস্র দুই পাটি দাঁত ওই বাঘের মত ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল,—ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—কি বুললি বেইমান?

শম্ভু আর কোন কথা বলিল না, অঙ্কুশভীত বাঘের মত ভঙ্গিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেইমান তাহাকে এতবড় কথাটা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের বয়সটাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পুরুষ, তুই তো বুড়া! রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই বুড়া ছাড়া আর কি? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে? রাধিকা তাড়াতাড়ি আপনাদের তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সত্য কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতেরো। তাহারও তিন বৎসর পূর্ব্বে শিবপদ বেদের সহিত তাহার বিবাহ

হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বৎসর তিনেকের বড়। আজও তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ। সে চোখের দৃষ্টি, যেন মায়াবীর দৃষ্টি! সাপ, বাঁদর, ছাগল এসবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ,—ধামা বুনিত, চেয়ার-পাল্কির কাজ করিত; তাহাতে তাহার উপার্জ্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশি। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বাহির হইত; সে কাঁধে ভার বহিয়া লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস; রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঁদর, ছাগল। শিবপদর সঙ্গে আরও একটি যন্ত্র থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা থাকিত বাঁশের বাঁশী! রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশী বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদর আরও একটা কতবড় গুণ ছিল! তাহাদের সামাজিক মজলিসে বৃদ্ধদের আসরেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ, এবং লেখাপড়াও কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল, এইজন্য তাহার পরামর্শ প্রবীণেরাও গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে সম্মান কত তাহার! আর সেই শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মত। টাকাকড়ি সব থাকিত রাধিকার কাছে। তাঁতে বোনা কালো রঙের জমির উপর সাদা সূতার খুব ঘন ঘন ঘরকাটা শাড়ি পরিতে রাধিকা খুব ভালবাসিত, শিবপদ বারো মাস সেই কাপড়ই তাহাকে পরাইয়াছে।

এই সময় কোথা হইতে দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর আসিল এই শম্ভু, সঙ্গে এই বাঘটা, একটা ছেঁড়া তাঁবু, আর এক বিগতযৌবনা বেদেনী। বাঘ ও তাঁবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। রাধিকা প্রথম যেদিন শম্ভুকে দেখিল, সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে! সে এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠদেহ মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভুও তাহাকে দেখিতেছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত; সে-ই প্রথম ডাকিয়া বলিল,—এই বেদেনী, দেখি তুর সাপ কেমন?

রাধিকার কি যে হইয়াছিল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল,—নাগরের সখ দেখি যে খুব! পয়সা দিবা?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল,—পয়সা দিব না; তু সাপ দেখালে আমি বাঘ দেখাব।

বাঘ! রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা? যেমন অদ্ভুত চেহারা, তেমনই কি অদ্ভুত কথা; বলে বাঘ দেখাইবে! সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল,—সত্যি বুলছ?

—বেশ, দেখ আগে আমার বাঘ দেখ! সে তাহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া গিয়া সত্যই বাঘ দেখাইয়াছিল। সবিস্ময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল,—ই বাঘ নিয়া তুমি কি কর?

—লড়াই করি, খেলা দেখাই।

—হাঁ?

—হাঁ, দেখবি তু?—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা দুই হাতে ধরিয়া বাঘের সহিত মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বি্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল,—তু এইবার সাপ দেখা আমাকে!

রাধিকা সে কথার উত্তর দেয় নাই, বলিয়াছিল,—উটা তুমার পোষ মেনেছ?

হি হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সবলে তাহাকে জড়াইয়া বলিয়াছিল,—হি, বাঘিনী পোষ মানাইতে আমি ওস্তাদ আছি।

কি যে হইয়াছিল রাধিকার, এক বিন্দু আপত্তি পর্য্যন্ত করে নাই। দিনকয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদর বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে

তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা-বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ছি-ছি করিয়াছিল; কিন্তু রাধিকা সে গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার আনীত শিবপদর অর্থেই শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার অন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল। সে অর্থ আজ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, দুঃখেই দিন চলে আজকাল; শম্ভু যাহা রোজগার করে, সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্য দুঃখ করে নাই। আর বেইমান কিনা এই কথা বলিল? সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।

ওদিকে নূতন তাঁবুতে আবার বাজনা বাজিতেছে! দোসরা দফায় খেলা আরম্ভ হইবে। মদ খাইয়া রাধিকা হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, ওই বাজনার শব্দে তাহার অন্তরটা যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। উহাদের তাঁবুতে নিশীথরাত্রে আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

সহসা তাহাদের তাঁবুর বাহিরে শম্ভুর ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে মত্ততার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিষ্টো। তাহার পরনে ঝক্‌ঝকে সাজ-পোশাক, চোখ রাঙ্গা, সে-ই তখন কথা বলিতেছিল,—কেনে, ইথে দোষটা কি হ'ল? তুমরা ব'সে রইছ, আমাগোর খেলা হছে। খেলা দেখবার নেওতা দিলাম, তা দোষটা কি হ'ল?

শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল,—খেল দেখাবেন খেলোয়াড়ী আমার! অপমান করতে আস্‌ছিস্ তু।

কিষ্টো কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই উত্তেজিত রাধিকা একটা ইট কুড়াইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মারিয়া বসিল। অব্যর্থ লক্ষ্য, কিন্তু কিষ্টো অদ্ভুত, সে বলের মত সেটাকে লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর ইটটাকে লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল। বিস্ময়ে রাধিকা সামান্য কয়টা মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সে ঘোর কাটিতেই সে বর্দ্ধিত উত্তেজনায় আবার একটা ইট কুড়াইয়া লইল; শম্ভু তাহাকে নিবৃত্ত করিল, সে সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল

আবেগে শম্ভুর গলা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভ বলিল,—এই মেলার বাদেই বাঘ কিনে লিয়ে আসব।

ওদিকের তাঁবু হইতে কিষ্টোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল,— খোল কানাৎ, ফেলে দে খুল্যে।

তাঁবুর একটা ছেঁড়া ফাঁক দিয়া রাধিকা দেখিল, তাঁবুর কানাৎ খুলিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ভিতরে না গেলেও তাহারা যেন দেখিতে বাধ্য হয়। সে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—দিব আগুন ধরাইয়া তাঁবুতে!

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরৎ দেখাইতেছে। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—নতুন খেলা কিছু বার কর তুমি, নইলে বদনামী হবে, কেউ দেখবে না খেলা আমাগোর।

শম্ভু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল,—কাল পুলিসে ধরাইয়া দিব শালাকে। মদের সন্ধান দিয়া দিব!

ওদিকে টিয়াপাখীতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের উপর ছাতা মাথায় দিয়া নাচিল, বাঘটার সহিত কিষ্টো লড়াই করিল, ইঃ—একটা থাবা বসাইয়া দিল বাঘটা।

রাধিকা আপনাদের খেলার দৈন্যের কথা ভাবিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল! সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশেও ফুলিতেছিল। তাঁবুটা আগুন ধরিয়া ধূ ধূ করিয়া জলিয়া যায়! কেরোসিন ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

পরদিন সকালে উঠিতে রাধিকার একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল; উঠিয়া দেখিল, শম্ভু নাই; সে বোধ হয় দুই চারজন মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিষ্টোর তাঁবুর চারিপাশে পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে একজন দারোগা বসিয়া আছেন। এ কি? সে

সটান গিয়া দারোগার সামনে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন, ডাক সব, আমরা তাঁবু দেখব!

আবার সেলাম করিয়া বেদেনী বলিল,—কি কসুর করলাম হুজুর?

—মদ আছে কিনা দেখব আমরা। ডাক বেটাছেলেদের এইখান থেকেই ডাক।

রাধিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই তাঁবুরই লোক ভাবিয়াছেন, কিন্তু সে আর তাঁহার ভুল ভাঙিল না। সে বলিল,—ভিতরে আমার কচি ছেলে রইছে হুজুর—

—আচ্ছা, ছেলে নিয়ে আসতে পার তুমি। আর ডেকে দাও পুরুষদের।

রাধিকা দ্রুত তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা জায়গাটার আল্‌গা মাটি সরাইয়া দেখিল, তিনটা বোতল তখনও মজুত রহিয়াছে। সে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বোতল তিনটাকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া বুকে ধরিল যে, শীতের দিনে সযত্নে বস্ত্রাবৃত অত্যন্ত কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁবুর মধ্যেই কিষ্টো অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পায়ের ঠেলা দিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিয়া রাধিকা বলিল, পুলিস আস্‌ছে, ব'সে রইছে দুয়ারে, উঠ্যা যাও।

সে অকম্পিত সংযত পদক্ষেপে-স্তন্যদানরত মাতার মত শিশুকে যেন বুকে ধরিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পিছনেই কিষ্টো আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগা প্রশ্ন করিলেন,—এ তাঁবু তোমার?

সেলাম করিয়া কিষ্টো বলিল,—জী, হুজুর।

—দেখব তাঁবু আমরা, মদ আছে কিনা দেখব।

মেলার ভিড়ের মধ্যে শিশুকে বুকে করিয়া বেদেনী ততক্ষণে জলরাশির মধ্যে জলবিন্দুর মত মিশিয়া গিয়াছে।

শম্ভু গুম হইয়া বসিয়া ছিল, রাধিকা উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। শম্ভু তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শম্ভু ফিরিয়া আসিতে বিপুল কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিসকে ঠকানোর বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল,—ভেল্কি লাগায়ে দিছি দারোগার চোখে।

শম্ভু কঠিন আক্রোশভরা দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিল, রাধিকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে হাসিয়া বলিল,—খাবা, ছেলে খাবা ?

শম্ভু অতর্কিতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিয়া বলিল,—সব মাটি ক'রে দিছিস তু; উয়াকে আমি জেহেলে দিবার লাগি পুলিসে ব'লে এলাম, আর তু করলি এই কাণ্ড!

রাধিকা প্রথমটায় ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুর কথা সমস্তটা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল গত রাত্রির কথা। সত্যই, একথা শম্ভু তো বলিয়াছিল! সে আর প্রতিবাদ করিল না, নীরবে শম্ভুর সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ণ হইতে এ তাঁবুতেও খেলা আরম্ভ হইবে।

শম্ভু আপনার জীর্ণ পুরাতন পোশাকটা বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙের চোঙার মত সরু প্যাণ্টালুন, আর একটা কালো রঙেরই খাটো-হাতা কোট। রাধিকার পরনে পুরানো রঙিন ঘাঘরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুলহাতা বডিস্। অন্য সময় মাথার চুল সে বেণী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত; কিন্তু আজ সে বেণীই বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞায় ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল। উহাদের তাঁবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মত গাল-মোটা, স্থবিরার মত স্থূলাঙ্গী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জির মত টাইট পাজামা, জামা তাহার উপর জরিদার সবুজ সাটিনের একটা জাঙ্গিয়া ও কাঁচুলি ঢঙের বডিস্। কুৎসিত মেয়েটাকেও যেন সুন্দর দেখাইতেছে। উহাদের জয়ঢাকটার বাজনার মধ্যে কাঁসা-পিতলের বাসনের আওয়াজের মত একটা বেশ

শেষকালে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। আর এই কতকালের পুরানো ঢ্যাপঢ্যাপে জয়ঢাক, ছি—!

কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, জোরে করতাল পেটে।

শম্ভু বাজনা থামাইয়া হাঁকিল, ও–ই ব—ড় বা—ঘ!

রাধিকা রুদ্ধ স্বর কোনমতে সাফ করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বড় বাঘ কি করে?

শম্ভু খুব উৎসাহভরেই বলিল, পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মানুষের মাথা মুখে ভরে, চিবায় না।

সে এবার লাফ দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া বাঘটাকে খোঁচা দিল, জীর্ণ বৃদ্ধ বনচারী হিংস্রক আর্ত্তনাদের মত গর্জ্জন করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ও-তাঁবুর ভিতর হইতে সবল পশুর তরুণ হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাচার উপরে রাধিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার শরীর যেন ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। ক্রূর হিংসাভরা দৃষ্টিতে সে ওই তাঁবুর মাচানের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিষ্টো হাসিতেছে! রাধিকার সহিত চোখোচোখি হইতেই সে হাঁকিল—ফিন একবার!

ও-তাঁবুর ভিতর হইতে দ্বিতীয়বার খোঁচা খাইয়া উহাদের বাঘটা এবার প্রবলতর গর্জ্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। রাধিকার চোখে জ্বলিয়া উঠিল আগুন। জনতা স্রোতের মত কিষ্টোর তাঁবুতে ঢুকিল।

শম্ভুর তাঁবুতে অল্প কয়েকটি লোক সস্তায় আমোদ দেখিবার জন্য ঢুকিল। খেলা শেষ করিয়া মাত্র কয়েক আনা পয়সা হাতে শম্ভু হিংস্র মুখ ভীষণ করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা দ্রুতপদে মেলার মধ্যে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিল একটা কিসের টিন লইয়া।

শম্ভু বিরক্তি সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কি উটা?

—কেরাচিনি। আগুন লাগায়ে দিব উয়াদের তাঁবুতে। পুরা পেলম নাই, দু' সের কম রইছে। তাহার চোখ জ্বলিতেছে!

শম্ভুর চোখও হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল! সে বলিল,—লিয়ে আয় মদ।

মদ খাইতে খাইতে রাধিকা বলিল,—দাউ দাউ করে জ্বলবেক যখন!

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অন্ধকারের মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ওই তাঁবুতে তখনও খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ছেঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল, কিষ্টো দড়িতে ঝুলানো কাঠের লাঠিতে দোল খাইতে খাইতে কসরত দেখাইতেছে, উঃ, একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া ঢুলিতে লাগিল! দর্শকেরা করতালি দিতেছে।

শম্ভু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, এখুন লয়, সেই—নিশুত-রাতে!

তাহারা আবার মদ লইয়া বসিল।

সমস্ত মেলাটা শান্ত স্তব্ধ; অন্ধকারে সব ভরিয়া উঠিয়াছে। বেদেনী ধীরে ধীরে উঠিল, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চোখে ঘুম আসে নাই। বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দ্দান্ত জ্বালায় সে অহরহ যেন পীড়িত হইতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার থম থম করিতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। সে খানিকটা এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কেহ কোথাও জাগিয়া নাই। সে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালিল, ওই কেরোসিনের টিনটা রহিয়াছে। তারপর শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সে শীতে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। অপমান ভুলিয়া গিয়াছে,—ঘুম আসিয়াছে! সে শম্ভুকে ডাকিল না, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া, টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহিরে চলিয়া গেল।

ওই পিছন দিক হইতে দিতে হইবে। ওদিকটা সমস্ত পুড়িয়া গেলে তবে এদিকে মেলার লোকে আলোর শিখা দেখিতে পাইবে। ক্রূর হিংস্র সাপিনীর মতই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া শন শন করিয়া চলিয়াছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া সে হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

চুপ করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁবুর ভিতরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে কানাতটা সন্তর্পণে ঠেলিয়া বুক পাতিয়া মাথাটা গলাইয়া দিল। সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার! সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া ফস করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।

তাহার কাছেই এই যে কিষ্টো একটা অসুরের মত পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে! রাধিকার হাতের কাঠিটা জ্বলিতেই লাগিল, কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস! উঃ, বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলা কি নিটোল! তাহার আশেপাশে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে! ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা—ওই দুর্দ্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন! দেশলাইয়ের কাঠিটা নিবিয়া গেল।

রাধিকার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্তা বেদেনী মুহূর্ত্তে যাহা করিয়া বসিল, তাহা স্বপ্নের অতীত। সে উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

কিষ্টো জাগিয়া উঠিল, কিন্তু চমকাইল না, ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল,—কে? রাধি—

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাধিকা বলিল,—হ্যাঁ, চুপ।

কিষ্টো চুমায় চুমায় তাহার মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল, দাঁড়াও, মদ আনি।

—না। চল, উঠ, এখুনই ইখান থেক্যে পালাই চল।

রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইতেছিল।

কিষ্টো বলিল,—কুথা?

—হু-ই, দেশান্তরে।

—থাক পড়্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উহার রাধিকে লিবা, উয়াকে দাম দিবা না?

সে নিম্নস্বরে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উন্মত্ত বেদিয়া, তাহার উপর দুরন্ত যৌবন—কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল,—চল।

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল,—দাঁড়াও।

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল,—চল।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল,—মরুক বুড়া পুড়্যা!

পিতা-পুত্র

আহ্নিক গতিতে পৃথিবী আবর্ত্তিত হয়, দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর হয় দিন, যুগের শেষে হয় যুগান্তর, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির কত রূপান্তর হয়। এই রূপান্তরের মধ্য দিয়া জগৎ চলে,—যুগের পথ-চলা। নিয়তির লীলার আকর্ষণেই হউক আর মানুষের ভবিষ্যৎ-সন্ধানী মনের চালনাতেই হউক, সমষ্টিগতভাবে মানুষ চলে, সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও চলিতে হয়। কিন্তু বিপ্রনান্দী গ্রামখানি যেন ইহার ব্যতিক্রম। অবশ্য গতিশীল জগতের সঙ্গে গ্রামখানির যোগসূত্রও যে অত্যন্ত ক্ষীণবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বোলপুর রেল-ষ্টেশন বারো মাইল দূরে, মোটর-বাস বা ট্যাক্সি আসিবার রাস্তা পর্য্যন্ত নাই; কাঁচা রাস্তায় যানের মধ্যে সনাতনী পদ্ধতিতে গরুর গাড়ি কোন রকমে চলে, আর বাহনের মধ্যে চলিতে পারে ঐ এক গরুই, ক্ষুর জোড়া বলিয়া কাদায় ঘোড়াও চলে না। কিন্তু গরুর উপর মানুষের চড়া চলে না, কাজেই আপন চরণজোড়া ছাড়া অন্য বাহনও অচল। কিন্তু এই যোগসূত্রের ক্ষীণতাই ইহার

অচলতার হেতু নয়। কারণ এই অচলতার মধ্যে জড়তা গ্রামখানিকে স্পর্শ করে নাই, একটি অটল মহিমায় সে সূর্য্যকরদীপ্ত পাহাড়ের চূড়ার মত দাঁড়াইয়া আছে। আশপাশের গতিশীল জগৎ অহরহ তাহাকে টানিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু বিপ্রনান্দী গ্রাম নড়ে না। বারো মাইল দূরে ট্রেন চলিয়া যায়, নিশীথ রাত্রে তাহার শব্দ-তরঙ্গে গ্রামের শূন্যমণ্ডলে শিহরণ উঠে, মাটির বুকে সঞ্চারিত কম্পনবেগে গৃহপ্রাচীর কাঁপে, মধ্যে মধ্যে গ্রামের যুবকেরা দশ জনে মিলিয়া দশমুণ্ড রাবণের মত কুড়ি হাতে জীবনকে নাড়া দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ফল হয় না। সামান্য একটু কম্পন অনুভব করিলেই, কৈলাস-শিখরাসীন বিশ্বম্ভরের মত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ বিপ্রনান্দীর বুকে পদনখাগ্র চাপিয়া ধরেন, সঙ্গে সঙ্গে সব স্থির হইয়া যায়।

ন্যায়তীর্থ মানুষটি খর্বকায় ছোটখাট ; গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর, সর্ব অবয়ব একটি অনমনীয় দৃপ্ততার দীপ্তিতে ভাস্বর, অথচ তাঁহার মুখে চোখে কপালে ঠোঁটে একটি হাস্যময় প্রশান্তি ঝলমল করে। পরনে ক্ষারে-ধোয়া ধবধবে থান ধুতি, অনাবৃত বুকের উপর আঠায়-মাজা শুভ্র উপবীত, গলায় সোনার তারে গাঁথা ছোট্ট রুদ্রাক্ষের একগাছি মালা পরিয়া ন্যায়তীর্থ আপনার টোলের বারান্দায় ছোট একখানি চৌকির উপর বসিয়া থাকেন। তাঁহারই একটি অখণ্ড এবং প্রগাঢ় প্রভাব গ্রামখানিকে নিষ্কম্প দীপালোকের মত আলোকিত এবং আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। গ্রামে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেও তিনি চঞ্চল হন না, হাসিমুখেই তিনি কথা বলেন, কিন্তু তাঁহার খড়মের শব্দ তখন একটু উচ্চ ও কঠোর হইয়া উঠে, দাঁড়ান ঈষৎ দৃঢ়তর ঋজু ভঙ্গিতে—খড়মের চাপও যেন একটু বেশী পড়ে। তাহাতেই কাজ হইয়া যায়, চঞ্চল গ্রাম্য-জীবন স্থির হইয়া শান্ত হয়। তাই বলিতেছিলাম, কৈলাসবাসী বিশ্বম্ভরের মতই পদনখাগ্রে গ্রামের বুকখানাকে চাপিয়া ধরেন।

শিবশেখর ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু ভাগবতেই তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ়। এই প্রগাঢ় অনুরাগের জন্যই তিনি প্রাচীন ধর্মজীবনকে গ্রামখানির

মধ্যে প্রাণপণ শক্তিতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন। মাত্র গ্রামের মধ্যেই তাঁহার প্রভাব অখণ্ড এবং প্রগাঢ় হইলেও খ্যাতি তাঁহার বহুবিস্তৃত—বাংলা দেশে একজন মনীষী বলিয়া তিনি বিখ্যাত। বিশেষ করিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য, আলোচনা করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে মধ্যে মধ্যে অনেক পণ্ডিত এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াও তাঁহার নিকট আসিতেন। সে-বার একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসিয়া তাঁহার সন্ধান পাইয়া এখানে উপস্থিত হইলেন। শান্তিনিকেতন বিপ্রনান্দী হইতে মাইল দশেক পথ।

আলোচনা শেষ করিয়া ইউরোপীয় ভদ্রলোক হাসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকটিকে আপন ভাষায় কি বলিলেন। অধ্যাপক ঈষৎ হাসিয়া ন্যায়তীর্থকে বলিলেন,—ইনি কি বলছেন জানেন?

ন্যায়তীর্থ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

অধ্যাপক বলিলেন,—গ্রীক বীর আলেকজান্দার আমাদের দেশে এসে এক যোগী পুরুষকে দেখে বলেছিলেন,—আমি যদি আলেকজান্দার না হতাম, তবে এই ভারতের যোগী হ'তে চাইতাম। উনিও ঠিক সেই কথাই বল্লছেন। বলছেন—ইউরোপে না জন্মালে আমি ভারতবর্ষে এমনি পণ্ডিত হয়ে জন্মগ্রহণের কামনা করতাম।

ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন,—আমার এ ব্রাহ্মণ-জন্ম না হ'লেও আমি কিন্তু এই দেশের কীটপতঙ্গ হয়েই জন্মাতে চাইতাম, অন্যত্র জন্মকামনা করতাম না।

ইউরোপীয় পণ্ডিতটি ন্যায়তীর্থের কথার মর্ম শুনিয়া অতি মৃদু হাসিয়া অধ্যাপককে ইংরাজীতে বলিলেন,—একে আমরা বলি ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স।

অধ্যাপকটির মুখ লাল হইয়া উঠিলেও, ভদ্রতার খাতিরে কোন রূঢ় প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ন্যায়তীর্থ ইংরাজী বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু বক্তার হাসির রূপ ও ভঙ্গি হইতে ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সুরটুকু বেশ বুঝিলেন।

তবুও তিনি কথাগুলির মর্মার্থ বুঝিবার কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, প্রশান্ত হাসিমুখেই সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু ন্যায়তীর্থের যোগ্য পুত্র শশিশেখর দৃঢ়স্বরে ইংরাজীতে বলিয়া উঠিল, না, ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নয়, এই তাঁর অন্তরের বিশ্বাস। তোমাদের পাশ্চাত্য বিদ্যায় মনকে তোমরা বুঝতে পার, কিন্তু তার বেশী কিছু পার না; আত্মাকে তোমরা চেন না। আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল চিত্তজয়—আত্মোপলব্ধি; আমাদের মন আত্মাকে পরিচালিত করে না, আত্মার নির্দেশে মনকে চলতে হয় বাহনের মত।

ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অধ্যাপকটি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন—পাছে পরিণতিতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটিয়া যায়। ন্যায়তীর্থ বিপুল বিস্ময়ে বিস্মিত হইয়া শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তিনিই সে বিস্ময়কে জয় করিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—শশী, তুমি ওঁকে কি বলছ তার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু যা বলছ সেটা ভঙ্গিতে ও স্বরে বড় রূঢ় ব'লে মনে হচ্ছে আমার! উনি আমাদের অতিথি, তুমি গৃহস্থ, আপন ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘন করছ।

শশিশেখর চুপ করিল। বক্তব্য তাহার শেষই হইয়াছিল, তবুও তাহার ঈষৎ সঙ্কুচিত ও লজ্জিত ভঙ্গির মধ্যে ন্যায়তীর্থের আজ্ঞা পালনে আনুগত্যটুকু বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি শশিশেখরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এই তরুণ বন্ধুটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

অধ্যাপক বলিলেন,—ইনিই ন্যায় তীর্থের পুত্র, শশিশেখর ন্যায়তীর্থ। এই বৎসরই ন্যায় উপাধি পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

—উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। বলিয়া শশিশেখরকে অভিবাদন করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিলেন, আমি বড় আনন্দ লাভ করলাম আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। সকলের চেয়ে বেশি আনন্দ হ'ল, আপনি ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেছেন। সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বার আপনার কাছে এখন উন্মুক্ত।

আশা করি, নিতান্ত সংস্কারবশেই আপনি সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না !

শশিশেখর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, সহস্র ধন্যবাদ আপনাকে। পাশ্চাত্য দর্শন পড়ব ব'লেই আমি ইংরেজী শিখেছি।

গ্রামের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইউরোপীয় পণ্ডিতটির সঙ্গে গিয়া বিদায় দিয়া শশিশেখর বাড়ী ফিরিল। খানিকটা আসিতে আসিতেই মন তাহার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তাহার গোপন কথা আজ উত্তেজনার অসতর্ক অবস্থায় পিতার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত ইংরেজী পড়িতে ন্যায়তীর্থ বাধা দেন নাই। স্বীকার করিয়াছিলেন, রাজভাষা সাংসারিক প্রয়োজনেও একটু দরকার। স্কুলে পড়াটা শেষ করাই ভাল।

শশিশেখর প্রথম বিভাগে বেশ কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিল। তাহার স্কুলের একজন শিক্ষক ন্যায়তীর্থকে অনুরোধও করিল, আপনি শশীকে কলেজেই পড়তে দিন! ভবিষ্যতে ও খুব ভাল ফল করবে। অঙ্কে কাঁচা ব'লেই শশী বৃত্তি পেলে না, নইলে সংস্কৃতে, ইংরেজীতে খুব ভাল ফল করেছে।

ন্যায়তীর্থ প্রসন্ন হাস্যের সহিত বলিয়াছিলেন, আপনি ভালবাসেন শশীকে, আপনার কল্যাণ হোক। কিন্তু আপনি যা বলছেন, সে হয় না মাষ্টার মশায়!

—কেন? ইংরেজী খারাপ কিসে?

তেমনি হাসিয়াই ন্যায়তীর্থ বলিলেন—না-না, ইংরেজী বিদ্যার উপর আমার বিদ্বেষ নেই কিছু, তবে আস্থাও নেই। আর আমাদের বংশগত বিদ্যার উপর একটা বিশেষ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস দুইই আছে। ইংরেজী জ্ঞানের দৃষ্টিটা নিতান্তই ইহলৌকিক, চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টির ওপারে আর তার গতি নেই। অথচ 'অবাঙ-মনস-গোচরের' সাধনা আমাদের কুলধর্ম্ম। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ; সুতরাং ও অনুরোধ আর করবেন না।

মাষ্টার ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, আমাদের ইচ্ছা ছিল শশিশেখর সংস্কৃত এবং ইংরেজী দুইয়েই পণ্ডিত হয়।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন, ওটা নিতান্তই বিলাতী ধরণে পিণ্ড রাঁধার ব্যবস্থা মাষ্টার মশাই। জীবনের সাধনা একমুখী হওয়াই ভাল। মন দ্বিধাবিভক্ত হ'লে অবস্থা হবে গরুর ক্ষুরের মত, দ্রুত চলার শক্তি হারিয়ে যাবে। জন্মান্তরের ফের বেড়ে যাবে।

মাষ্টার মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন শুধু, মুখে কিছু বলিলেন না। ন্যায়তীর্থ বলিলেন, আর শিখলেও তো খানিকটা। কাজ অনেকটা ওতেই চ'লে যাবে। মাষ্টার হাসিলেন, বলিলেন, ও যা শিখেছে তাতে ভাল ক'রে কথা কওয়াও চলে না, ন্যায়তীর্থ মশাই।

এ অনেক দিনের কথা! ইহার পর শশিশেখর ন্যায়তীর্থের কাছেই কয়েক বৎসর পড়াশুনা করিয়া ব্যাকরণ পরীক্ষা দিল, তারপর সাহিত্য অলঙ্কার পড়িয়া দর্শন পড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময়েই ন্যায়তীর্থ তাহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন! কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, চিকিৎসকের যেমন আপনার পরম আত্মীয়ের চিকিৎসা করা উচিত নয়, এও তেমনি আর কি! আমার অনেকগুলি ছাত্র, শশী এখানে পড়লে শিক্ষা আমার পক্ষপাতদুষ্ট হ'তে পারে।

শশিশেখর নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায় পড়িতে পড়িতে চোখের আড়ালের সুযোগ পাইয়া সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে ইংরাজীর চর্চ্চাও আরম্ভ করিল। মনীষী পিতার মেধাবী সন্তান সে, তাহার উপর ছিল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। ন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই সে পাশ্চাত্য দর্শন মোটামুটি পড়িয়া ফেলিল। শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও তাহার আয়ত্ত হইয়াছে। এ সংবাদ ন্যায়তীর্থের কাছে অতি যত্নে সে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাহা এমনি এক অভাবনীয় ঘটনা-সংস্থানে উত্তেজনাময় অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

শশিশেখর মনে মনে শঙ্কিত হইয়াই বাড়ি ফিরিল।

প্রশান্ত মুখেই ন্যায়তীর্থ বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া ইতিমধ্যেই একটি ক্ষুদ্র জনতা জমিয়া উঠিয়াছে। একদিকে টোলের ছাত্রেরা দাঁড়াইয়া আছে, ন্যায়তীর্থের কয়েকজন বন্ধু ও ভক্ত একখানি কম্বল বিছাইয়া আসর করিয়া সম্মুখেই বসিয়াছে, এমন কি সদ্‌গোপ-পাড়ার জন তিনেক মণ্ডলও আসিয়া বারান্দার নীচে উপু হইয়া বসিয়া আছে।

কোন একটা কথা হইতেছিল। শশিশেখর আসিয়া দাঁড়াইতে কথাটার যেন মোড় ফিরিয়া গেল। ন্যায়তীর্থের বন্ধু হিরণ্যভূষণ চক্রবর্ত্তী শশীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, এস বাবাজী এস। তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছ। মহৎ থেকেই মহতের উদ্ভব হয়, উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান তুমি। তোমা হ'তে বিপ্রনান্দীর গৌরব বজায় থাকবে। বলিহারি, বলিহারি! ইংরেজী বলে গেলে তুমি একেবারে ঝর ঝর ক'রে— খাজা বিলিতী সাহেবের সঙ্গে!

প্রৌঢ় হরিশ চাটুয্যেও ন্যায়তীর্থের বন্ধু, গ্রামের মধ্যে তিনি বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি, তিনি বলিলেন, কথাটা তোমার ঠিক হ'ল না হিরণ্য, শশিশেখর হ'তে গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি হবে। ন্যায়তীর্থের বংশের মুখ আরও উজ্জ্বল হবে। পুত্রের কাছে পরাজয় মহাভাগ্যের কথা। শিবশেখর ধার্ম্মিক জ্ঞানী। জ্ঞানবান পুণ্যবানের বংশ। এমন ভাগ্য শিবশেখরের হবে না তো কি হবে তোমার আমার? পুণ্যবল না থাকলে কি ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়!

শশিশেখরের শঙ্কা ইহাতেও দূর হইল না, সে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ন্যায়তীর্থের মুখ প্রসন্ন, এতক্ষণে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, দশের আশীর্ব্বাদই হ'ল ভগবানের আশীর্ব্বাদ। এ সমস্তই হ'ল তোমাদের দশ জনের স্নেহের ফল হরিশ। এখন আশীর্ব্বাদ করো যেন শশী স্বধর্ম্মচ্যুত না হয়।

হরিশ চাটুয্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—সহস্র বার, লক্ষ বার সে আশীর্ব্বাদ করি এবং আজও করছি শিবশেখর।

হরিশের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ-বাক্যকে সমর্থন করিয়া একটি মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তুলিয়া ফেলিলেন। শশিশেখর অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, এমনভাবে প্রংশসার অজস্র বর্ষণের মধ্যে চোখ তুলিয়া সে যেন দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—প্রণাম করো শশী। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন আর তুমি প্রণাম করতে ভুলে গেলে! ইংরাজী শিক্ষা না ক'রে যদি শুধু সংস্কৃত শাস্ত্র পড়তে, তবে এ ভুল তোমার কখনই হ'ত না।

শশিশেখর অতিমাত্রায় লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি সকলকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। হরিশ কিন্তু বলিলেন, এটা তোমার বক্রোক্তি হল ভাই ন্যায়তীর্থ। শুধু বক্রই নয়, তীক্ষ্ণও যথেষ্ট পরিমাণে।

ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন, অলঙ্কৃত করতে গেলেই নাক কান সূচ দিয়ে ফুঁড়তে হয় হরিশ। সূচ তীক্ষ্ণ এবং অলঙ্কারগুলি এক্ষেত্রে বক্রই হয়ে থাকে।

ঠিক এই সময়েই সকলকে প্রণাম শেষ করিয়া শশিশেখর ন্যায়তীর্থকে প্রণাম করিল। ন্যায়তীর্থের অসাধারণ সংযম সত্ত্বেও চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখে তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু হাতখানি ছেলের মাথার উপর রাখিলেন।

হিরণ্যভূষণ বলিলেন, কিন্তু তুমি এমন ইংরেজী কেমন ক'রে শিখলে শশী? একেবারে ঝর ঝর ক'রে জলের মত ব'লে গেলে! কি বলে এন্‌টেরান্স না ম্যাট্রিক পাশ তো হামেসাই দেখছি হে,—বি, এ, এম, এ, পাশ করা উকিলের বহরও দেখেছি। একেবারে ঝর ঝর ক'রে জলের মত অ্যাঁ—।

শশী কুণ্ঠিতভাবে সংক্ষেপে ইংরাজী শেখার ইতিহাস প্রকাশ করিয়া বলিয়া অপরাধীর মতই ন্যায়তীর্থের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিশ শশীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা খানিকটা অনুমান করিয়া

লইলেন, শিবশেখর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, শশীকে এর জন্য তোমার পুরস্কৃত করা উচিত শিবশেখর। শশিশেখরের এ সাধনা একলব্যের সাধনার সঙ্গে তুলনীয়।

শিবশেখর হাসিয়া বলিলেন, পুরস্কৃত না করলেও তিরস্কার করব না হরিশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছি।

হরিশও হাসিয়া বলিলেন, বুঝবে বইকি শিবশেখর, আমাদের পরস্পরকে জানা যে অনেক দিনের। বাল্যকালে চীৎকার ক'রে ডাকলে তুমি চীৎকার ক'রে সাড়া দিয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে. আবার আম-জাম চুরির মতলব নিয়ে যখন চুপি চুপি জানালার ধারে দাঁড়াতাম, তখন তুমিও বেরিয়ে আসতে চুপি চুপি খিড়কির দোর দিয়ে। আমাকে বুঝতে। কোন দিনই তোমার ভুল হয় না। যে দিন ভুল হবে, সে দিন বুঝব তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়েছে তোমার। সে দিন তুমি তোমার গৃহিণীকেও বুঝতে পারবে না।

শিবশেখরের অন্তরঙ্গের দল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শশিশেখর এবং অল্পবয়স্কেরা লজ্জিত হইয়া মাথা নিচু করিল; শিবশেখরও লজ্জিত হইলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, রসের আধিক্য হ'লে বিকার হয় হরিশ, তুমি বৈদ্যের শরণাপন্ন হও।

হরিশ বলিলেন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও তোমার পড়া আছে ন্যায়তীর্থ; আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে তোমার আহ্বান রইল। ষড় রস আস্বাদন করতে করতে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে। বাবাজীকেও নিয়ে যেতে হবে। বাবাজীকে খাইয়ে দাইয়ে তারপর দু'জনে ব'সে একসঙ্গে খাব, বুঝলে?

মজলিস শেষ করিয়া ন্যায়তীর্থ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, গৃহিণী যেন প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে তাঁহার শঙ্কার ছায়া। ব্যস্ত হইয়া ন্যায়তীর্থ প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে শিবরাণী, তুমি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে?

শিবরাণী কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন,—হ্যাঁ গো, শশী নাকি তোমাকে না জানিয়ে ইংরেজী শিখেছে?

হাসিয়া শিবশেখর বলিলেন,—হ্যাঁ। সাহেবটীর সঙ্গে চমৎকার ইংরেজীতে কথা কইলে! তুমি রত্নগর্ভা!

—তুমি রাগ করেছ? সত্যিই শশী অন্যায় করেছে।

—না-না-না, রাগ করব কেন শিবরাণি, শশী আমাদের বংশগৌরব উজ্জ্বল করেছে। এ কি রাগ করবার কথা?

এতক্ষণে শিবরাণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, আমার কিন্তু ভারী ভয় হয়েছিল। তার ওপর খড়মের শব্দ শুনে—আজ তোমার খড়মের শব্দ টোলের বারান্দা থেকে শোনা যাচ্ছিল!

শিবশেখর শিবরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—রাগ নয়, দুঃখ আমার হয়েছিল শিবরাণী; শশিশেখরের এ কথাটা এতদিন ধ'রে আমার কাছে গোপন ক'রে রাখাটা উচিত হয় নি।

সন্তানের অপরাধ শিবরাণীই যেন মাথায় করিয়া লইলেন, মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন,—সত্যিই এ শশীর অপরাধ। আমি শশীকে বলব।

—না না না। উপযুক্ত ছেলে, তা ছাড়া—শশী আজও পর্য্যন্ত কোন দুঃখ আমাদের দেয়নি। এ নিয়ে তাকে কিছু বললে সে কি মনে করবে? তা-ছাড়া বউমা কি মনে করবেন?

—কি আবার মনে করবেন? শশীই বা কি মনে করবে? কেন করবে?

শিবরাণী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবশেখর বলিলেন,—নাঃ, অপরাধের চেয়ে গুণের পরিচয়ই শশীর বেশী। তাকে আমার পুরস্কৃত করাই উচিত। তুমি অনিরুদ্ধ স্বর্ণকারকে একবার ডাকাবে তো, বউমার জন্যে একজোড়া রুলি গড়াতে দেব, শশীর জন্যে একটি আংটি আর চন্দ্রশেখরের জন্যে বিছেহার।

চন্দ্রশেখর শশিশেখরের এক বৎসরের খোকা।

শিবরাণী হাসিয়া বলিলেন,—আর ছেলের মা বুঝি বাদ যাবে?

ন্যায়তীর্থও হাসিলেন, বলিলেন,—স্ত্রীলোকের ঈর্ষা সাহিত্যকারদের মিথ্যা কল্পনা নয়; অলঙ্কারের বিষয়ে মাতা কন্যার ঈর্ষা করে, কন্যা মাতার ঈর্ষা করে।

শিবরাণী ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতেই বলিলেন,—আর পুরুষেরা?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন, পুরুষেরা যা নিয়ে বিবাদ করে, ভগবান তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। সাম্রাজ্য দূরের কথা, সামান্য বিষয়ও আমার নেই শিবরাণী। ক' বিঘে ব্রহ্মত্র, তাও নারায়ণের। দাও এখন আমার আহ্নিকের জায়গা ক'রে দাও।

পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মাটির ঘর, দেওয়ালগুলি রাঙা মাটির গোলা দিয়া নিকানো; প্রদীপের মৃদু আলোয় চারিদিকে একটি নম্র, পরিচ্ছন্ন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পিলসুজের উপর প্রদীপটি জ্বলিতেছিল, তাহারই সম্মুখে আসনের উপর বসিয়া শশিশেখর কি লিখিতেছিল। ঘরের ভেজানো দুয়ার ঠেলিয়া শিবশেখর ঘরে প্রবেশ করিলেন। শশিশেখর কিন্তু মুখ ফিরাইল না, পিছন দিক হইতেও শিবশেখর পুত্রের একাগ্রতার গভীরতা সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করিলেন। একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবেই ডাকিলেন, শশি!

সে আহ্বানে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া শশী বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া গেল।

তাহার বিবাহের পর ন্যায়তীর্থ কখনও তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন নাই। শিবশেখর কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন,—কোন আলোচনা করছ বুঝি?

শশী ততক্ষণে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাপের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল—আমাকে কিছু বলছেন?

হাসিয়া শিবশেখর বলিলেন—আমাকে দেখে এত চঞ্চল হচ্ছ কেন শশি!

তুমি উপযুক্ত হয়েছ, পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছ। এখন আমরা পিতাপুত্রে আলোচনা করব, তর্ক করব।

শশী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তোমার কাছে আমার কিছু শিক্ষার বিষয় আছে শশী। পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমি তোমার কাছে পেতে চাই, ইংরেজী ভাষা আমি জানি না। তুমি আমায় অনুবাদ ক'রে বলবে, আমি শুনব।

শশিশেখর এবারও মুখে কথার জবাব দিল না, নীরবে বাপের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় স্পর্শ করিল। স্নেহের উচ্ছ্বসিত আবেগে ন্যায়তীর্থের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—তুমি আমার মুখোজ্জল-কারী পুত্র। তুমি দীর্ঘজীবী হও, ধর্ম্মে জ্ঞানে নিষ্ঠা তোমার অটুট থাক।

শশী নীরবে মাথা নত করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। শিবশেখর বোধ করি শশীর একাগ্রতার কথা তখনও ভুলিতে পারেন নাই, তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—এমন একাগ্রভাবে কি লিখছিলে শশী? কোন পত্র কি?

শশী কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বলিল—আজ্ঞে না। আমি বেদান্ত ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করছি।

ন্যায়তীর্থের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি কোনও কথা না বলিয়া বিপুল আগ্রহে শশীর আসনে বসিয়া খাতাখানি টানিয়া লইলেন। পরক্ষণেই বলিলেন—আমার চশমা জোড়াটা আন ত শশি।

শশী চশমা আনিয়া হাতে দিতেই গভীর মনঃসংযোগ করিয়া শশীর লেখার উপর তিনি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলেন।

"শব্দস্পর্শাদয়োবিদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক।
ততোবিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপান্ন ভিদ্যতে॥"

ন্যায়তীর্থ শ্লোকের নীচের টীকায় মনোনিবেশ করিলেন। অদ্ভুত!

এত চমৎকার টীকা করিয়াছে শশিশেখর! ন্যায়তীর্থ শ্লোকের পর শ্লোক, পাতার পর পাতা পড়িয়া চলিলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বি-প্রহর হইয়া আসিল। গৃহিণী শিবরাণী আসিয়া কাশিয়া সাড়া দিয়া স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন। ন্যায়তীর্থ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পড়িতে পড়িতেই বলিলেন—কি, হ'ল কি?

—রাত্রি যে দুপুর গড়িয়ে এল।

—কি হয়েছে তাতে? আমার শুতে বিলম্ব আছে।

—বউমা চাঁদকে কোলে ক'রে দাওয়ায় ব'সে ব'সে ঢুলছেন। মশায় যে খেয়ে ফেললে! শশীও যে শুতে পাচ্ছে না।

—ও! বলিয়া খাতার পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া আবার বলিলেন—তত্ত্ব-বিবেক অধ্যায়টা শেষ হলেই উঠব। একটু অপেক্ষা কর। আমি যা পারিনি, শশী তাই ক'রেছে। শশী গ্রন্থ রচনা করেছে।

অধ্যায়টি শেষ করিয়া তিনি খাতাখানি হাতে লইয়া উঠিয়া আপনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। শিবরাণী প্রশ্ন করিলেন—শশী গ্রন্থরচনা করেছে?

বেদান্তের প্রভাব হইতে তখনও ন্যায়তীর্থ মুক্ত হন নাই, তবুও একাগ্র গম্ভীর মুখে অল্প একটু হাসি টানিয়া বলিলেন—হুঁ।

স্নেহ-গৌরবে পুলকিত শিবরাণী বলিলেন—কেমন হয়েছে?

—সুন্দর, চমৎকার! কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—সঠিক এখন বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে যেন জ্ঞানে শুষ্কতা একটু প্রকট হয়ে উঠেছে।

শিবরাণী তেলের বাটী, জল ও গামছা লইয়া স্বামীর পায়ের তলায় বসিয়া বলিলেন—সে তুমি দেখে-শুনে দিয়ো।

ন্যায়তীর্থ চিন্তা-বিভোর অবস্থাতেই বলিলেন—দেব!

স্বামীর একটা পা টানিয়া লইয়া শিবরাণী বলিলেন—কি এত ভাবছ বল তো ?

মৃদু হাসিয়া এবার যেন কতকটা সচেতন ভাবে ন্যায়তীর্থ বলিলেন—বড় কঠিন চিন্তা ক'রছিলাম শিবরাণী। ফলভোগের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে মনে।

শিবরাণী রহস্যের সুরেই হাসিয়া বলিলেন—আমার এক মুস্কিল হয়েছে বাপু; স্বামী পণ্ডিত, ছেলে পণ্ডিত, কে যে কি বলছে, মূর্খ মানুষ আমি, বুঝতেই পারি না। আবার ওই চাঁদটা, সেও এক পণ্ডিত হবে আর কি !

গম্ভীর মুখেই ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এইবার সংসার ত্যাগ ক'রে ভগবানের শরণ নেওয়া উচিত হয়েছে শিবরাণী। কিন্তু প্রলোভনও হচ্ছে, এমন ছেলে নিয়ে ঘর করি—বাপ-বেটায় মিলে আগেকার কালের মত পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয় ক'রে আসি। কিন্তু বর্ত্তমানের সুখের মধ্যেই নাকি ভবিষ্যতের দুঃখ লুকিয়ে থাকে, সেই হেতু ফলভোগের অধিকার গীতায় নিষিদ্ধ। চল, এইবার আমরা কোনও তীর্থ গিয়ে বাস করব !

শিবরাণী অবাক হইয়া গেলেন। ন্যায়তীর্থের এমন সঙ্কল্পের কথা তাঁহার কাছে একবারে অপ্রত্যাশিত, ইহার পূর্ব্বে কোনও দিন ঘূণাক্ষরেও ন্যায়তীর্থ প্রকাশ করেন নাই, শিবরাণীও আভাসে পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারেন নাই।

কিছুক্ষণ পর বিস্ময়ের ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন—তোমার যত উদ্ভট কল্পনা ! সুখের মধ্যে দুঃখ লুকিয়ে থাকে ?

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কথাটা যেন ভাবিয়া বুঝিয়া দেখিলেন, তারপর বলিলেন,—থাকে ত থাক। এই যদি বিধানই হয়, তবে তা মাথা পেতে নিতেও হবে।

ন্যায়রত্ন চুপ করিয়া রহিলেন। এমনই ধারার উদ্ভট চিন্তায় মন তাঁহার উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে।

প্রগাঢ় যত্নের সহিত সমস্ত খাতাখানি পড়িয়া, অনেক চিন্তা করিয়া শশিশেখরের রচনার কয়েকটি স্থান ন্যায়তীর্থ সংশোধন করিয়া দিলেন; শশিশেখর খাতাখানি লইয়া ঘরে আসিয়া সংশোধন করা জায়গাগুলি দেখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম সংশোধন শশী দেখিল—'সুস্পষ্ট' শব্দটিকে কাটিয়া ন্যায়তীর্থ লিখিয়াছেন 'বিস্পষ্ট'। আবার সে পাতা উল্টাইল। বেলা অনেক হইয়াছে, বধূ চারু আসিয়া বলিল—মা স্নান করতে বললেন। বেলা কত হয়েছে দেখ তো!

শশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খাতাটির সংশোধিত পাতাগুলিতে কাগজ দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল। শিবরাণী নিজেই ততক্ষণে আসিয়া হাজির হইলেন, বলিলেন—বাবা, তোমাদের বাপ-বেটার বিদ্যের আঁচে আমাদের শাশুড়ী-বউয়ের হাড়ে কালি পড়ল। গরম ভাত যে কেমন, তা ভুলেই গেলাম।

শশিশেখর অপরাধ বোধ করিল, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল,—কই, এর আগে তো ডাক নি তুমি!

শিবরাণী হাসিয়া বলিলেন—দোষ হয়েছে বাবা! তোমাদের ক্ষিদে পেয়েছে, সেটা আমার মনে ক'রে দেওয়া উচিত ছিল! ক্ষিদে-তেষ্টা বুঝতে না পারা পণ্ডিতদের একটা লক্ষণ, ওটা আমি জানতাম না! ব'স, আমি মাথায় তেলটা দিয়ে দিই। ছেলের মাথায় তেল দিতে দিতে শিবরাণী বলিলেন,—হাঁরে, উনি তোর খাতা দেখে কেটেকুটে ঠিক ক'রে দিলেন?

শশিশেখর চিন্তান্বিত হইয়াই তেল মাখিতেছিল, মায়ের কথা তাহার কানে ঢুকিলেও মনকে যেন স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না, সে চিন্তাবিভোর ভাবেই উত্তর দিল—হ্যাঁ, দিয়েছেন।

শিবরাণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কি ভাবছিস এত?

শশী উত্তর দিল—ভাবি নি। এমনি আর কি!

রাত্রেও শশী এমনি চিন্তান্বিত ভাবে খাতাখানি খুলিয়া বসিয়া ছিল। চারু আসিয়া ছেলেকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বামীকে এমনি ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—হ্যাঁ গো, তুমি সারাদিন এমন ক'রে কি ভাব্ছ বল তো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল—বড় সমস্যায় পড়েছি চারু! বোধ হয় এমন সমস্যায় জীবনে কখনও পড়ি নি।

চারু বলিল—বেশ! ঠাকুরের কাছে যাও না। দেশ বিদেশের লোক এসে তোমার বাপের কাছ থেকে মুস্কিলের আসান ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি ঘরে ব'সে মুস্কিল নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছ!

শশী কথার উত্তর দিল না, একটু হাসিল।

চারুর মনে হইল শশী তাহাকেই অবজ্ঞা করিয়া হাসিল, এই জন্য সে রাগ করিয়াই প্রশ্ন করিল—হাসলে যে?

শশী আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও। তারপর বলছি। চারু দরজা বন্ধ করিয়া দিল, শশী বলিল—ব'স এইখানে, একটা পরামর্শ দাও দেখি। তুমি আমার সচিব, সখী, অনেক কিছু। একথা তুমি ছাড়া আর কাউকে বলার আমার উপায় নেই, মাকে পর্য্যন্ত না। কথা যে বাবাকে নিয়েই।

কথাটার ভূমিকা শুনিয়াই চারু ভয় পাইয়া গেল, সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শশী বলিল অত্যন্ত মৃদুস্বরে—বাবা যে সংশোধনগুলি করেছেন, সেগুলি ভাষার দিক দিয়েই সংশোধন করেছেন, দু-এক জায়গায় বৌদ্ধশূন্যবাদ সম্পর্কে মন্তব্যে তিনি অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়েছেন। কিন্তু দুই-ই আমার মতে অন্যায় হয়েছে। ভাষার দিক দিয়ে প্রাচীন ধারা অনুযায়ী আধুনিক লেখার সংশোধন খাপ খায় না; কটু হয় শুনতে, আরও অনেক দোষ হয়। আর বৌদ্ধশূন্যবাদ কেউ গ্রহণ করতে না পারে,

কিন্তু বিদ্বেষ নিয়ে তাকে বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে গ্রন্থকারকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে।

চারুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, ভয়ার্ত্ত অথচ মৃদুস্বরে সে বলিল—না, না, ওগো, বাবাকে তুমি অমান্য ক'র না।

শশী চিন্তিত ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে অস্বীকারের ভঙ্গিতে ধীরভাবে বার কয় মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল—জ্ঞান হ'ল সত্য সত্যের মর্য্যাদা আমি ক্ষুণ্ণ করতে পারব না চারু।

বহুদিনের রঙ-করা মাটির পুতুলের মত চারু বসিয়া রহিল।

কয়েকদিন পর সেদিন প্রাতঃকালেই টোলের একটি ছাত্র বাড়ীর ভিতর আসিয়া শশিশেখরকে ডাকিল—অধ্যাপক মশায় ডাকছেন আপনাকে।

শশী সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া আসিল। টোলের ছেলেরা বারান্দায় বসিয়া পড়িতেছে, ন্যায়তীর্থ অভ্যাসমত ছোট চৌকিটির উপর বসিয়া আছেন, শশী আসিয়া বিনীতভাবে প্রশ্ন করিল, আমাকে ডেকেছেন?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—হ্যাঁ। ব'স। তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে। ব'স, কম্বলের উপর ব'স। দেখ, কয়েকদিন থ'রেই আমি একটা ভাবছি—ভাগবতধর্মের তত্ত্বব্যাখ্যা বোধ হয় আমার লিপিবদ্ধ ক'রে যাওয়া উচিত। কি বল তুমি?

শশী উৎসাহিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। এটা আপনার কর্ত্তব্য ব'লে আমার মনে হয়।

—তা হ'লে আরম্ভ ক'রে দেওয়াই উচিত, কি বল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবার মৃদু হাসিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—দেখ, কাজটা আমি আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। অপেক্ষা কর, আমি আসছি। বলিয়া তিনি উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া খালি পায়েই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। শশী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাপের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও তাঁহার আজিকার এই উৎসাহ দেখিয়া সে

মনে মনে কৌতুক বোধ না করিয়া পারিল না। চারিদিকে ছাত্রেরা মৃদু-গুঞ্জনে পড়িতেছে ; তাহার মধ্য হইতে সহসা একটা কথা যেন তাহার কানে আসিয়া খট করিয়া বাজিল। কথাটা—বিস্পষ্ট। শশী ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিল—শোন। 'বিস্পষ্ট' না ব'লে 'সুস্পষ্ট' বল। 'বিস্পষ্ট' কথাটা ধ্বনির দিকে রূঢ় আর ব্যবহারেও প্রায় অপ্রচলিত।

ছেলেটি বলিল—আজ্ঞে না, ওটা বিশেষ রূপে স্পষ্ট কিনা। সু-শব্দ সুন্দরদ্যোতক—ওতে কাব্যের মাধুর্য্য আছে।

হাসিয়া শশী বলিল—তা হ'লে সুকঠিন প্রয়োগ-বিধিটা ভুল হ'ত। প্রচলন ভেদে ধাতুগত অর্থের তারতম্য হয়ে যায়, সেটাকে স্বীকার ক'রে নিলে শব্দের মধ্যে অর্থের ব্যাপকতা বাড়ে ; তাতে ভাষার গৌরব বৃদ্ধিই হয়।

ঠিক এই সময়েই গলার সাড়া দিয়া ন্যায়তীর্থ বাহির হইয়া আসিলেন।

আসনে বসিয়া খাতাখানি কোলের উপর রাখিলেন, তারপর বলিলেন—তুমি 'বিস্পষ্ট' স্থলে 'সুস্পষ্ট' ব্যবহারের পক্ষপাতী শশি।

শশী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, শব্দের ধ্বনি—

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তোমার যুক্তি শুনেছি আমি। তারপর ছাত্রটির দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওটা তুমি এখন 'বিস্পষ্ট'ই প'ড়ে যাও পরে আমি বিচার ক'রে দেখব।

ছাত্রটি চলিয়া গেল। ন্যায়তীর্থ নীরব হইয়াই বসিয়া রহিলেন, খাতাখানি কোলের উপরেই পড়িয়া রহিল ; তিনিও শশীর হাতে তুলিয়া দিলেন না, শশীও নিজে হাত বাড়াইয়া লইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শশী বলিল—তা হ'লে—

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—হ্যাঁ, যেতে পার তুমি। মনে খানিকটা উত্তাপ জমা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে যেন তাঁহার কোন হাত ছিল না। ধীরে ধীরে সে উত্তাপ কমিয়া আসিলে মনে মনে তিনি শশীর যুক্তিকে স্বীকার করিয়া লইলেন। ছাত্রটিকে ডাকিয়া এ কথা বলিবার পূর্বে তিনি শশীকে কথাটা

জানানো প্রয়োজন মনে করিলেন। শশীর রচনার মধ্যেও তিনি প্রথমেই 'সুস্পষ্ট'কে কাটিয়া 'বিস্পষ্ট' করিয়াছেন। সেটিও নিজে হাতে কাটিয়া দিবার সঙ্কল্প লইয়া শশীর ঘরের দুয়ারে আসিয়া ডাকিলেন—শশি!

ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিল পুত্রবধূ চারু। ন্যায়তীর্থ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শশী নাই। চারু ঘর পরিষ্কার করিতেছিল। ন্যায়তীর্থ বাহিরে আসিতে গিয়া আবার ঘুরিলেন, শশীর কলমটি তুলিয়া লইয়া খাতাখানি খুলিলেন। দেখিয়াও তিনি যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না! তাঁহার লেখা 'বিস্পষ্ট' শব্দ কাটিয়া আবার 'সুস্পষ্ট' লেখা হইয়া গিয়াছে! কলমটি তিনি রাখিয়া দিলেন। তারপর একে একে পাতা উল্টাইয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত সংশোধন শশী কাটিয়া দিয়াছে। ন্যায়তীর্থের হাত কাঁপিতেছিল, পাতার লেখা সেই কম্পনহেতু আর পড়া যায় না; তিনি খাতাখানি রাখিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেওয়ালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—বউমা, খড়ম জোড়াটা এগিয়ে দাও তো।

চারু খড়ম জোড়াটি আনিয়া একরূপ পায়ে পরাইয়া দিল। ন্যায়তীর্থ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। চারু শঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া গেল, নীচে রান্নাঘরে শিবরাণীর হাতের দ্রুত-সঞ্চালিত খুন্তি স্তব্ধ হইয়া গেল। এ কেমন খড়মের শব্দ! অপটু পায়ের চালিত খড়মের শব্দের মত ছন্দহীন কেন? অথবা অধীর ন্যায়রত্নের পায়ের অস্থিরতা হেতু এমন অসমচ্ছন্দ পা পড়িতেছে!

ন্যায়তীর্থ যেন অতিমাত্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন, অথচ সেই স্তব্ধতার মধ্যে তাঁহার নিকটে আসিবার অবসরও কেহ পায় না। পুঁথির সাগরে তিনি ডুব দিয়াছেন। যে সময়টা পড়েন না, সে সময় তিনি ঠিক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। কথা বলিলে দুই-একটার উত্তর দেন; বাকীগুলি নিরুত্তরই রহিয়া যায়। সেদিন তখন তিনি বসিয়াই ছিলেন, বন্ধু হরিশ চাটুয্যে একখানি কাগজ হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ন্যায়তীর্থ সংক্ষেপে আহ্বান করিলেন—এস!

হরিশ স্থূল দেহখানি লইয়া ধপ করিয়া কম্বলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—হ্যাঃ, হাঁপ ধরে গেল, মোটা শরীর নিয়ে ছোটা কি সোজা কথা! জিভ বেরিয়ে গেল। ক'টি মেয়ে দেখে যা হাসলে শিবশেখর, লজ্জায় আমি থেমে গেলাম।

ন্যায়তীর্থ অল্প একটু হাসিলেন, নিতান্ত ভদ্রতা রক্ষার জন্য শুষ্ক হাসি। হরিশ কাগজখানি ন্যায়তীর্থের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—নাও দেখ!

—কি?

—সেই সাহেবের কাণ্ড। 'ভারতে কি দেখিলাম' তাই লিখেছে খবরের কাগজে। এখানকার কথা, তোমাদের পিতা-পুত্রের খুব প্রশংসা ক'রে সব লিখেছে। অমর আমাকে পত্র লিখেছে, কাগজও পাঠিয়ে দিয়েছে।

অমর হরিশের বড় ছেলে, কলিকাতায় চাকরি করে।

কাগজখানি হাতে লইয়া ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন—দুধ ব'লে পিটুলি গোলা খাওয়াচ্ছ যে! এ যে ইংরেজী!

হরিশ বলিলেন—বাবাজী কই, আমাদের পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিতপ্রবর? পড়ুক, প'ড়ে শোনাক আমাদের। তবে অমর লিখেছে আমাকে মোটামুটি। সাহেব বলেছে,—বলিয়া পকেট হইতে অমরের পত্র বাহির করিয়া পড়িলেন—একটা বড় দুর্গম গ্রামের মধ্যে এমন প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া বিস্ময়কর ব্যপার। সমুদ্রের তলদেশের মণিরত্নের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। অথচ দেশের গভর্ণমেণ্ট এঁদের খোঁজ রাখেন না, এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু হ'তে পারে না। পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পুত্র সংস্কৃত এবং ইংরেজী উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত, প্রাচ্য-প্রতীচ্য দর্শনে ইনি পিতার মতই সুপণ্ডিত। ভাবীকালে এঁর ভবিষ্যৎ—

বাধা দিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—থাক। প্রশংসার কামনায় শাস্ত্রচর্চ্চা করিনি হরিশ, ওতে আমার প্রয়োজন নাই। ওটা বরং শশীকে পাঠিয়ে

দাও। তরুণ বয়স, তাতে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাব কিছু আছে—সে পড়ে খুশী হবে।

হরিশ হাসিয়া বলিলেন—সেই ভাল। ওহে, এটা আমাদের বাবাজীকে দিয়ে এস তো; কি নাম তোমার?

হরিশ বলিলেন—কিন্তু তোমার এমন ভাবান্তর হ'ল কেন বল দেখি? তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ!

শিবশেখর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তোমার কাছে গোপন করব না হরিশ। আমি বড় অশান্তি ভোগ করছি; ভবিষ্যতের চিন্তায় একটু ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। এই টোল, দেবসেবা চলবে কি ক'রে?

হরিশ বলিলেন—তোমার এমন পণ্ডিত পুত্র—

বাধা দিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তো অন্নবস্ত্র হয় না হরিশ! অর্থের প্রয়োজন, দিন দিন সংসার বাড়ছে! কিন্তু শশী বাড়ী থেকে বেরোবে না। আমি তাকে বলতে পারছি না। তুমি যদি তাকে একটু বুঝিয়ে বল হরিশ।

হরিশ কিছু বলিবার পূর্ব্বে শশীই কাগজখানি হাতে বাহির হইয়া আসিল। প্রসঙ্গটা তখনকার মত বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু অপরাহ্ণে শশী নিজেই প্রসঙ্গটা তুলিয়া বলিল—আমি এইবার বাড়ী থেকে বের হতে চাই বাবা; উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে চাই আমি।

পলকের জন্য ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া সম্মুখে নিবদ্ধ করিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—বেশ!

মাইল কয়েক দূরে মহকুমা শহরে শশিশেখর এক টোল খুলিয়া বসিল। চাকরির চেষ্টা সে করিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপকটির কাছেও সে গিয়াছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অভাবে সেখানে কোন সম্মানজনক

পদলাভ সম্ভব হয় নাই। স্কুলে চাকরির ব্যবস্থা হইতে পারিত, কিন্তু শশী নিজে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল, আসিয়া বলিল—ষড়দর্শন প'ড়ে অবশেষে 'কিলোৎপাটীব বানর কথা' পড়াতে পারব না আমি, মাপ করবেন।

দেশে ফিরিয়া এই শহরটিতে কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারীর উৎসাহে সে টোল খুলিয়া বসিল। সেই ইউরোপীয় পণ্ডিতটির লেখার কথা ইহারই মধ্যে দেশে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীরা শশিশেখর সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন—আপনি আরম্ভ করুন টোল; সরকারী সাহায্য আমরা যেমন ক'রে হোক ক'রে দেব।

শশী টোল খুলিয়া প্রচার করিল, প্রাচ্য-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্য দর্শনের মর্ম্মও সে ছাত্রদের শিক্ষা দিবে।

অকস্মাৎ সেদিন পিতৃবন্ধু হরিশ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে অমর শশীর টোলে আসিয়া হাজির হইল। কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার পথে স্টেশনে নামিয়া গাড়ী না পাইয়া শশীর শরণাপন্ন হইল। পরম সমাদরে শশী অভ্যর্থনা করিয়া তাহার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অমর বলিল—তুমি ভাই, এমন খাতির করলে তো আমাকে বিদেয় নিতে হয় এখুনি।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতটি অপ্রতিভের মত হাসিল মাত্র, উত্তর দিতে পারিল না।

অমর বলিল—তুমি শুধু বন্ধু নও। তুমি আমাদের গৌরব। সেদিন কাগজে যখন ঐ লেখাটা পড়লাম শশী, তখন বলব কি তোমাকে, আনন্দে আমার চোখে জল এল। আমাদের মেসের প্রত্যেককে আমি কাগজখানা দেখিয়েছি, আর বলেছি—দেখ, আমাদের গ্রাম কেমন দেখ!

শশীর চোখমুখ এবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেও লজ্জিত ভাবে বৃষ্টিধারনমিত ফলবান বৃক্ষের মতই মাথা নত করিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শশী বলিল—তোমাকে পত্র আমি লিখতাম অমর, তা দেখা হয়ে গেল ভালই হ'ল। কিছু চাঁদা তোমাকে দিতে হবে!

—তোমার টোলের জন্য ?

—না-না। আমাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর সুধাকৃষ্ণ মুখুজ্জে মহাশয় উদ্যোগ ক'রে জেলাতে এবার পণ্ডিত-সভা আহ্বান করেছেন, আমায় করেছেন সম্পাদক। অবশ্য টাকাকড়ি সাহেবের ঠেলাতেই উঠবে। তবু সম্পাদক যখন হয়েছি তখন আমি দু-দশ টাকা যা পারি তোলবার চেষ্টা করছি।

অমর একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বলিল—নিশ্চয় দেব। আর কলকাতায় আমাদের জেলার যে সব লোক আছেন—তাঁদের কাছেও যাব আমি। তুমি বরং সায়েবের সই-করা কয়েকখানা চিঠি আমায় দিয়ো! জ্যেঠামশায় নিশ্চয় সভাপতি হবেন ?

—না, তাঁকে অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি করা হয়েছে। কাশীর মহামহোপাধ্যায় শ্যামাচরণ তর্করত্ন হবেন সভাপতি।

—বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে! তারপর নীরবে কিছুক্ষণ অমর যেন কল্পনায় ভাবী সভার রূপ দেখিয়া লইয়া আবার বলিল—তোমরা বাপ-বেটায় একদিকে দাঁড়ালে যেখান থেকেই যিনি আসুন শশী, আমাদের জেলারই জয় হবে এ একেবারে নিশ্চিত।

শশী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পরাধীন দেশে পাণ্ডিত্যের কোন অর্থ হয় না অমর, আর্থিক ব্যর্থতার কথাই শুধু বলছি না আমি; পরাধীনতার জন্যে এমন মনোভাব হয়েছে যে, প্রাচীন পণ্ডিত ভুল বললেও তার প্রতিবাদ করাটা পর্য্যন্ত অন্যায়ের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েছে।

অমর বলিল—তার জন্যে ভাবনা কি তোমার, জ্যেঠামশায় তোমার পাশে থাকবেন, তিনি তো আর নবীন নন।

কথাটা শেষ করিয়া অকস্মাৎ সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল—নবীন বলতে একটা কথা মনে হ'ল। তোমার বউ কোথায় ?

হাসিয়া শশী বলিল—বাড়ীতে।

—এখানে নিয়ে এস। কত আর হাত পুড়িয়ে খাবে?

—তোমারও তো তাই। ঐ যে বললাম, ও স্বাধীনতা পর্য্যন্ত আমাদের নেই।

অমর সরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কথাটা বড় ভাল বলেছ শশী!

এই বিংশ শতাব্দীতেও জেলার সদর শহরটি পণ্ডিত-সভার অধিবেশনে চঞ্চল উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর সুধাকৃষ্ণবাবু বয়সেও প্রাচীন এবং হিন্দুধর্ম্মও অনুরাগী ব্যক্তি। দীর্ঘকাল শাসনবিভাগে কাজ করিয়া মধুচক্র হইতে মধুনিষ্কাশনের কৌশলেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল প্রচুর। তিনি নিজে অধিবেশনে উপস্থিত থাকায় জেলার ধনী জমিদার, রায়সাহেব, রায়বাহাদুর এমন কি জেলার একমাত্র রাজাসাহেব পর্য্যন্ত সভা অলঙ্কৃত করিয়া হাজির ছিলেন। সাহেব হাসিলে তাঁহারা হাসিতেছিলেন, গম্ভীর হইলে গম্ভীর হইতেছিলেন আর কোন পণ্ডিতের বক্তব্য শেষ হইলে হাততালি দিতেছিলেন—সজোরে।

অধিবেশন-প্রারম্ভে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সভার উদ্বোধন করিলেন, বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন—এই জেলায় এখনও সংস্কৃত-চর্চ্চার গৌরব অটুট আছে। বিশেষ ক'রে পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ ও তাঁর পুত্র পণ্ডিত শশিশেখর ন্যায়তীর্থের গৌরবে এ জেলা গৌরবান্বিত। পণ্ডিত শশিশেখরকে এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারছি না। তিনি না থাকলে এ সভা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব হ'ত। তিনি নবীন এবং পাশ্চাত্য ভাষা, পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন ক'রে প্রাচীন কালের রক্ষণশীলতার প্রভাব হ'তে অনেকাংশেই মুক্ত। আজ যুগধর্ম্মকে স্বীকার ক'রে সংস্কৃত সাহিত্য এবং সংস্কৃতির উপর নূতন আলোকপাতের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন। সেই জন্যই তাঁর এ আন্তরিক প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। এ প্রয়োজনের পূরণের জন্য

মহামহোপাধ্যায় শ্যামাচরণ, পণ্ডিত শিবশেখর প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এখানে মিলিত হয়েছেন। আজ তাঁদের কাছে আমাদের নিবেদন উপস্থাপিত ক'রে আমি সবিনয়ে সভা আরম্ভ করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পণ্ডিতদের সাধুবাদ এবং রায়বাহাদুরগণের হাততালির মধ্যে সুধাকৃষ্ণবাবু উপবেশন করিলেন। পরমুহূর্ত্তেই সভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ন্যায়তীর্থ শিবশেখর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গম্ভীর প্রশান্ত মুখে কঠোর দৃঢ়তা, গায়ে গরদের চাদর, পরণেও দুধের মত সাদা গরদ, অনাবৃত। দক্ষিণ বাহুতে সোনার তারের তাগায় একটি প্রবাল ও রুদ্রাক্ষ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বাঁ হাতে আপনার অভিভাষণটি ধরিয়া বলিলেন—সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করবার জন্যই আমি দণ্ডায়মান হয়েছি। আমি প্রাচীন, কিন্তু বর্ত্তমান এই সভার রীতি-পদ্ধতি সমস্তই নবীন; সত্য বলতে কি এ ধরণের সভা আমাদের দেশে প্রচলিতই ছিল না। এ রীতি বৈদেশিক। প্রাচীনকালে সভা আহ্বান করতেন রাজা, ধনী, জমিদার যাঁরা তাঁরাই এবং তারও উপলক্ষ্য ছিল সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠান। এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে, সে পার্থক্য সূক্ষ্ম হ'লেও শূন্যমণ্ডলের মত অনতিক্রম্য ব'লেই আমার মনে হয়। সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বোচ্চে এবং সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত করতে হয় যজ্ঞেশ্বরকে। তাঁকে অনুভব ক'রে অনুষ্ঠানের সর্ব্বত্র বিরাজ করে ভক্তিসিক্ত নিষ্ঠা এবং সদাচার; সে প্রভাব এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রভাবিত করা অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। এ হ'ল শুষ্ক জ্ঞান প্রকাশের ক্ষেত্র।

এক দল প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ধ্বনি তুলিলেন—সাধু সাধু!

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—সুতরাং সেই ত্রুটি পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আমাদের করা উচিত। সেই জন্যই আপনাদের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ উচ্চারণ করার পূর্ব্বে যজ্ঞেশ্বরকে এই যজ্ঞস্থলে অধিষ্ঠিত হবার প্রার্থনা আমি জানাব।

সমগ্র সভাস্থল এবার সাধুবাদে মুখর হইয়া উঠিল। শুধু শশিশেখর বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কলরব প্রশমিত হইতেই তাহার পিতার কণ্ঠস্বর আসিয়া তাহার কানে পৌছিল। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু শশী তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

তাহার পর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় রচিত শ্লোকে ন্যায়তীর্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া বসিলেন। অতঃপর মূল সভাপতি মহামহোপাধ্যায়ের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সভা ভরিয়া উঠিল।

পরদিন ছিল বিচার-সভা।

সভার প্রারম্ভেই শশিশেখর উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। প্রসন্ন হাসি হাসিয়া মহামহোপাধ্যায় বলিলেন—জ্যোতিষ্কের ভগ্নাংশ থেকেই জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি, জ্যোতি হ'ল তার জন্মগত সম্পত্তি। কোন্ গুহাতে সে জ্যোতি ব্যাহত হ'ল, ছোট ন্যায়তীর্থ? বল শুনি!

—অদ্বৈত-পরমব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপে ভাসমান কিনা?

—নিশ্চয়ই।

—এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত ক'রেই ভাসমান?

—অবশ্য।

—চৈতন্যে যিনি সর্ব্বদা বিরাজিত, আহ্বান ক'রে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন প্রচেষ্টা সুতরাং ভ্রমাত্মক?

এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া মহামহোপাধ্যায় বলিলেন—স্বীকার করলাম।

ন্যায়তীর্থ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—আমি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বীকার করলাম না। স্বপ্নাতুর অবস্থাতেও মানব ভ্রমাত্মক চৈতন্য অনুভব করে। সেখানে আহ্বানের প্রয়োজন আছে।

শশিশেখর বলিল—জ্ঞানযোগীর ধ্যান নিদ্রাও নয়, স্বপ্নও নয়। যদি স্বপ্ন

হয় তবে সে জ্ঞানযোগী নয়, অন্যথায় আহ্বানকারীই ভ্রান্ত—সে-ই স্বপ্নাতুর, চৈতন্যের প্রয়োজন তারই।

মহামহোপাধ্যায় গম্ভীরমুখে বলিলেন—পণ্ডিত শশিশেখর, সভাপতি হিসাবে তোমাকে আমি নিবৃত্ত হ'তে আদেশ করছি। ন্যায়তীর্থ, আমি আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি!

উভয়েই নিরস্ত হইলেন; কিছুক্ষণ পরে ন্যায়তীর্থ বলিলেন—মহামহোপাধ্যায় যদি অনুমতি করেন তবে আমি উঠতে পারি। শরীর বড় অসুস্থ ব'লে মনে হচ্ছে আমার।

মহামহোপাধ্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ন্যায়তীর্থ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই পণ্ডিত শশিশেখর যুগধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া বৌদ্ধ দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত সমন্বয় করিয়া দর্শনের নূতন অধ্যায় রচনার প্রস্তাব উত্থাপন করিল। তীক্ষ্ণব্যঙ্গে গণ্ডীবদ্ধ মনোভাবকে বিদ্ধ করিয়া অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া স্খলিত ভাষায় অনর্গল সে বলিয়া গেল।

মহামহোপাধ্যায় তাহাকে স্বীকার করিয়া বলিলেন—তোমার প্রস্তাব সাধু। তোমাকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু সে ভার নিতে হবে তোমাদেরই। আমরা প্রাচীন, আমাদের সে ভার সাধ্যাতীত।

বাসায় আসিয়া ন্যায়তীর্থ বসিয়া ছিলেন স্তম্ভিতের মত। জ্বরগ্রস্তের মত মাথার মধ্যে একটা প্রদাহ তিনি অনুভব করিতেছিলেন। পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতেও পারিপার্শ্বিককে তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। রাজপথে মানুষ গাড়ী ঘোড়া যাইতেছে, আসিতেছে, কলরবের কথা কানে আসিতেছে, কিন্তু চিত্তে স্পর্শানুভূতি যেন হারাইয়া গিয়াছে।

মুখ দিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, মাথা নাড়িয়া তিনি যেন জাগিয়া

উঠিবার চেষ্টা করিলেন। হাঁ—তিনিই স্বপ্নাতুর, তাঁহারই চৈতন্যের প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া তিনি বালতি হইতে জল লইয়া বার-বার মাথাটা ধুইয়া ফেলিলেন। মাথাটা ধুইয়া তিনি খানিকটা সুস্থ বোধ করিলেন। নিজেই বিছানাটি বিছাইয়া লইয়া শুইয়া পড়িলেন। প্রায় সমস্ত দিনটা আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া অপরাহ্ণে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ছাত্র মণিভূষণ বলিল—শশীদাদা এসেছিলেন দু-বার। কিন্তু আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে ফিরে গেছেন।

ন্যায়তীর্থ গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন, সে শব্দের উচ্চতায় এবং অস্বাভাবিকতায় ছেলেটি চমকিয়া উঠিল। ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এবার এলেও তাকে নিষেধ ক'রে দিয়ো, কোন প্রয়োজন নাই। ব'ল—চৈতন্য আমার হয়েছে, আহ্বানে প্রয়োজন নেই।

খড়ম জোড়াটা পায়ে দিয়া তিনি ঘরের মধ্যেই পদচারণা আরম্ভ করিলেন, উচ্চ কঠোর শব্দ—অস্বচ্ছন্দ বা অসমছন্দ নয়, অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠিন।

কিছুক্ষণ পর আবার ছাত্রটি আসিয়া শঙ্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া ন্যায়তীর্থের মুখের দিকে চাহিল। ন্যায়তীর্থ আবার তেমনি ভাবে গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—কি ?

—রায় বাহাদুর জ্ঞানরঞ্জন বাবু এসেছেন, দেখা করবেন।

ব্যস্ত হইয়া ন্যায়তীর্থ বাহিরে আসিয়া সম্ভ্রমভরেই রায় বাহাদুরকে আহ্বান করিলেন—আসুন, আসুন।

হে-হে-হে শব্দে এক বিচিত্র হাসি রায় বাহাদুর হাসিয়া থাকেন, সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন—সায়েব পাঠালে আপনার কাছে। যেতে হবে আমার সঙ্গে। বাপ রে বাপ—খাটিয়ে মেরে ফেললে মশায়, আর বলবেন না। আমার দফা রফা, সব তাতেই বেটার আমাকে না হ'লে চলবে না। চলুন গাড়ী আছে আমার।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এখুনি ?

হে-হে করিয়া আবার হাসিয়া রায়বাহাদুর বলিলেন···হ্যাঁ হ্যাঁ। খেতাব দেবে মশায়···আপনি তো নেবেন না, তাই আপনার ছেলেকে খেতাব দেবে মহামহোপাধ্যায়। তবু আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করা তো দরকার। চলুন, চলুন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন···মণি, আমার চাদরখানা দাও তো।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সুধাকৃষ্ণবাবু শশীকে সত্যই স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনি মানুষও ছিলেন সত্যকার গুণগ্রাহী ব্যক্তি। আজিকার এই আহ্বানের মধ্যে আরও একটু উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল। পিতা-পুত্রের এই আকস্মিক মতদ্বৈধের রূঢ়তাটুকু মুছিয়া দিয়া উভয়ের সম্বন্ধের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিষ্ঠাও ছিল গোপন সঙ্কল্প। শশীকেও তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন। ন্যায়তীর্থকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিলেন—আপনার সঙ্গে পরিচয় লাভ ক'রে আমি গৌরব অনুভব করছি ন্যায়তীর্থ। পরম আনন্দলাভ করলাম।

ন্যায়তীর্থ সবিনয়ে বলিলেন—আপনি জেলার রাজ-প্রতিনিধি; আপনার সঙ্গে পরিচয় আমারও পরম সৌভাগ্য। রাজা-রাজপ্রতিনিধিরাই আমাদের রক্ষক, আপনারাই তো আমাদের ভরসা।

সুধাকৃষ্ণবাবু বলিলেন—অতি সত্য কথা। ত্রুটি আমাদেরই—আমরাই আপনাদের সন্ধান রাখি না, সম্মান করি না। সেই সায়েবের লেখার প্রতি এবার সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আপনাদের সম্মান সরকার করতে চান।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—আমাদের সৌভাগ্য।

—সম্মান অবশ্য উপাধি দিয়ে। তা' সরকারের পত্র পেয়ে আমি হাসলাম। মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ন্যায়তীর্থের গৌরব আর কি বৃদ্ধি হবে! নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—অকিঞ্চিৎকর হ'লেও যখন রাজার দান এবং আমার

প্রাপ্য তখন না নিলে উপায় কি বলুন! অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।

সুধাকৃষ্ণবাবু চুপ করিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পর বলিলেন—খুব সুখী হলাম আপনার কথা শুনে। সরকারকে আমি জানাব। শশিশেখরকেও আমরা দু-এক বছরের মধ্যেই উপাধি দেব। আর একটা কথা, শশী আজ বড়ই অন্যায় করেছে—তাকে আপনার মার্জনা করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে অনুতপ্ত হয়েছে।

কঠিন হাসি হাসিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তা হ'লে বলছেন, অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে; স্বপ্নাতুর বা তন্দ্রাতুর অবস্থা থেকে জাগ্রদবস্থায় অবস্থান্তর! আহ্বানের তা হ'লে প্রয়োজন আছে!

সুধাকৃষ্ণবাবু হাসিলেন, বলিলেন—তরুণ বয়সের ধর্ম্মকে সহ্য ক'রে নিতে হবে ন্যায়তীর্থ মশাই, না নিলে উপায় কি?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—দুদিন পরে, দুদিন পরে। আজ আদেশ করবেন না, পারব না। আজ আমি যাই।

ন্যায়তীর্থের খড়ম ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ন্যায়তীর্থ চলিয়া যাইতেই সুধাকৃষ্ণবাবু পাশের ঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিলেন—পণ্ডিত! শশীকে তিনি পাশের ঘরেই বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। সুধাকৃষ্ণবাবু উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন, ওপাশে দরজা খোলা, ঘরে কেহ নাই।

শশী সমস্তই শুনিয়াছিল। সে উদ্‌ভ্রান্তের মতই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সে স্পষ্ট অনুভব করিল তাহার প্রতিষ্ঠায় তাহার পিতার ঈর্ষা; জীবনের প্রতিটি ঘটনা আজ নূতন আলোকে আলোকিত হইয়া নূতন রূপে তাহার চোখে দেখা দিল। সহসা তাহার মাকে মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার সম্মুখে সে দাঁড়াইবে কেমন করিয়া! চলিতে চলিতে সে হোঁচোট খাইল, চটিটা ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

ধিক্কারে লজ্জায় তাহার মন ছি-ছি করিয়া সারা হইতেছে। মাথার ভিতরটা কেমন করিতেছে! মনে ইচ্ছা হইল—তুই হাতে দলিয়া পৃথিবীর সব কিছু যদি সে মুছিয়া দিতে পারিত।

চারিদিকে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে, সে বিভ্রান্তের মত লোকালয় ছাড়িয়া চলিল। কে যেন তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। সে তাহার পিতা—দাম্ভিক ন্যায়তীর্থ। শহর পার হইয়া ঘন জঙ্গল—জঙ্গলের পরে রেল-লাইন। শশিশেখর সেই জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

শশিশেখরের আর সন্ধান মিলিল না। সন্ধান করিয়া পরদিন মিলিল রেল-লাইনের উপরে কোন অসতর্ক পথিকের খণ্ড খণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহের মাংস, অস্থি, মেদ, অন্ত্র! মাথাটা পর্য্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চিনিবার উপায় নাই।

মাস-ছয়েক পর।

ন্যায়তীর্থ টোলের বারান্দায় অভ্যাসমত বসিয়া ছিলেন। ইহারই মধ্যে তিনি স্থবির হইয়া গিয়াছেন। পৌত্র চন্দ্রশেখর কাছেই দাওয়ার উপর বসিয়া একটা কাগজ চুষিতে ব্যস্ত ছিল। ন্যায়তীর্থ উদাস দৃষ্টিতে দিক্-চক্রবালের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

একটি ছাত্র সহসা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া চন্দ্রশেখরের হাত হইতে কাগজ-খানা কাড়িয়া লইয়া বলিল—এ-হে-হে, উপাধি-পত্রখানা নষ্ট ক'রে ফেললে!

কাগজখানি সরকার-প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধিপত্র,—আজই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সেটা আসিয়াছে। চন্দ্রশেখর এমন উপাদেয় ভোজ্য বস্তুটি হইতে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণে ন্যায়তীর্থের চমক ভাঙিল। তিনি পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—কি হ'ল, কাঁদছ কেন দাদু?

ছাত্রটি শঙ্কিত স্বরে বলিল—খোকা উপাধি-পত্রখানা মুখে পুরে নষ্ট ক'রে ফেলছে। ওটা নিয়ে নেওয়াতেই ও কাঁদছে।

ন্যায়তীর্থ ছাত্রের হাত হইতে উপাধি-পত্রখানা লইয়া খোকার হাতে তুলিয়া দিলেন।

ইতিহাস

হরপ্রসাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সমস্ত রাত্রিটাই তাহার ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই—তাহার উপর ভোর না হইতেই জানালার পাশে কতকগুলা ঘোড়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বিরক্ত হইয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ইচ্ছা থাকিলেও বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার উপায় নাই। অন্ধকার ঘর, তাহার উপর নূতন বাড়ী—ঘরের মেঝের উপর রাজ্যের জিনিষ স্তূপীকৃত হইয়া আছে, কোন কিছুর উপর পা পড়িলেই সর্ব্বনাশ। কয়টা বাজিয়াছে, সেও কিছু বোঝা যায় না। তাহার নিজের বাড়ীতে বিছানাতে বসিয়া দেওয়ালে হাত দিলেই আলোর স্থইচটায় হাত পড়িত, সেখানকার প্রতি পদক্ষেপের ভূমিটুকুর সহিত তাহার নিবিড় পরিচয় ছিল। তাহার নিজের জন্ম সেই গৃহে—তাহার পিতার জন্মও সেই গৃহে—তাহার পিতামহের কত সাধের বাসভবন। হরপ্রসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। দেনার দায়ে সেই বাড়ী ভাড়া দিয়া সে নিজে এই ছোট বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে। দশ বৎসর মহাজন বাড়ীখানা ভাড়া খাটাইয়া নিজের প্রাপ্য শোধ করিয়া লইয়া তাহাকে বাড়ী ফেরত দিবে। তবুও লোকটাকে ভাল বলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যেই তাহার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল:—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও দেনা শোধ লইবার জন্য বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানীর ভার লইয়াছিল! কিন্তু সে দেনা শোধ হইল কি-না সে হিসাব আজও হয় নাই। তাহার মনে পড়িল—

The system of Double Government proved a failure. The authorities in England now resolved to take on themselves the entire care and management of Bengal (1770), when a terrible famine devastated Bengal and carried away nearly one-third of its entire population—(ছিয়াত্তরের মন্বন্তর)!

শেষ রাত্রির হিম-কাতর নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া ষ্টীমারের ভোঁ বাজিয়া উঠিল। ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ। বাড়ীর অনতিদূরেই আদালতঘাট ষ্টীমার-ষ্টেশন। প্যালেজাঘাট হইতে ষ্টীমার আসিল! রাত্রি তাহা হইলে চারিটা! ষ্টীমারের চাকায় জল আলোড়নের শব্দও শোনা যাইতেছে। যাত্রীদের কলরব উঠিতেছে। মশারি তুলিয়া হরপ্রসাদ বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার জন্য পা বাড়াইল। এ কি! কিসে পা ঠেকিল? সঙ্গে সঙ্গে বাঁধানো মেঝের উপর কোন ধাতুপাত্র সশব্দে গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

—কে গো? কে গো?

অপরাধীর মত মৃদুস্বরে হরপ্রসাদ উত্তর দিল,—আমি!

—তুমি? পরক্ষণে ছায়া কঠোরস্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, বাপরে, বাপরে বাপরে, রাত্রেও কি শান্তিতে ঘুমুতে দেবে না তুমি? উঃ, কি অদৃষ্টই আমার! বলিতে বলিতেই ক্ষোভের মাত্রা তাহার বাড়িয়া উঠিল—সে সশব্দে আপনার কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল—ঝাড়ু মারি, ঝাড়ু মারি, ঝাড়ু মারি কপালে!

হরপ্রসাদ চুপ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। ধাতুপাত্রটার শব্দ-ঝঙ্কারের রেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন বায়ুতরঙ্গের ভিতর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। ইতিহাসে যদি 'এম-এ'-টা সে দিতে পারিত, তবে হয়ত ইতিহাসের মাষ্টার না হইয়া ইতিহাসের প্রফেসর হইত। আজ দেনার দায়ে বাড়ী ছাড়িতে হইত না।

রাজপথে অশ্বক্ষুরধ্বনি বাজিয়া উঠিল—ষ্টীমার-ঘাটের যাত্রী লইয়া এক্কাগুলা রেলষ্টেশনে চলিয়াছে। এই এক্কাগুলি একটা রহস্যময় যান। এত কাল চলিয়া গেল—কত বিচিত্র আকারের কত উন্নত প্রকারের যান আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু উহারা আজও টিকিয়া আছে। এই স্প্রিংগুলি যদি না থাকিত আর মাথার উপর ছত্রি থাকিত তবে ওই গাড়িতে চড়িয়া Reign of প্রিয়দর্শী অশোক দি গ্রেটের রাজত্বকালে যাওয়া যাইত। He is one of

the greatest kings in the whole world! 273 B. C.—দু'হাজার দুশো দশ বৎসর পূর্ব্বে—উঃ।

বাহিরে আবার ঘোড়াগুলা চীৎকার করিতেছে! এক্কার আড্ডা না-কি?

ছায়া আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুমন্তের লক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন অথচ ধীরে ধীরে বহিতেছে। হরপ্রসাদ সন্তর্পণে পা বাড়াইল। না, কিছু নাই—এখানেও কিছু নাই! ধীরে ধীরে নির্ব্বিঘ্নে এবার সে জানালার ধারে আসিয়া পৌঁছিল। জানালার কপাট ও বাজুর ফাঁকে একটা দীর্ঘ আলোক-রেখা দেখা যাইতেছিল। ঐ অস্পষ্ট আলোকের দীর্ঘ সরল রেখাটাই অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে ডাকিতেছিল। এবার কয়টা ছাগল ডাকিয়া উঠিল। হরপ্রসাদ সন্তর্পণে জানালাটা খুলিয়া ফেলিল। শেষ ডিসেম্বরের তীক্ষ্ণ বাতাসে মুখের চামড়ায় যেন সূচ ফুটাইয়া দিল, কিন্তু তবুও নির্ম্মল দিনরাত্রির বাতাসের অমৃত আস্বাদে বুকের ভিতরটা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বাহিরে সন্ধিক্ষণে আলো অন্ধকারের কুহেলিতে ঢাকা পৃথিবী আচ্ছন্নের মত স্তব্ধ।

ও, এটা জানোয়ারের হাসপাতালের একটা শাখা। প্রকাণ্ড একটা হাতার মধ্যে কয়টা চালা, আস্তাবলের মত অপরিসর অথচ লম্বা ঘরে কয়ভাগে বিভক্ত—ওইটায় বোধ হয় ঘোড়াগুলা থাকে। কাছেই এ চালাটায় গরু রহিয়াছে। গরুগুলির পিঠে চট চাপানো—সম্মুখে খুঁটিতে একটা বোর্ডে কাগজ ঝুলিতেছে। গরুগুলির গলায় একটা করিয়া তক্তি, নম্বর লেখা রহিয়াছে। মধ্যে একটা ছোট পাকাঘর, কি লেখা রহিয়াছে দেবনাগরী হরফে?—পাটলীপুত্র জান্‌বারকা হাসপাতাল!

হরপ্রসাদে মনে পড়িয়া গেল—

Formerly hundreds of animals were killed for the royal kitchen, but Asoka put stop to it. He also established hospitals for the beasts.—Asoka the Great! এইখানেই হয়ত প্রিয়দর্শী-প্রতিষ্ঠিত পশুচিকিৎসালয়ের ধ্বংসাবশেষ মাটির নীচে বিস্মৃতির অন্ধকারে

ডুবিয়া আছে। গঙ্গা, শোন, গণ্ডক ও পুনপুনের বন্যার পলিমাটিতে গৌরবময় পাটলীপুত্র ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেছে। মহামানব শাক্যমুনি অজাতশত্রুর নবদুর্গ-প্রাকারের দিকে চাহিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন – আনন্দ, এইখানে এক মহানগরী গড়িয়া উঠিবে। অগ্নিদাহ অথবা জলপ্লাবনে কিন্তু সে নগরী বিলুপ্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে!

মৌর্য্য, সুঙ্গ, কন্ব, গুপ্ত, তারপরই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন শতাব্দী—Dark age; এই Dark age-এর ইতিহাস যদি কোনরূপে উদ্ধার করিতে পারা যায়—

—বলি, হ্যাঁ গা, তুমি কি ধারার মানুষ? এই শীতের ভোরবেলা জানলা খুলে দাঁড়িয়ে আছ? শীতের বাতাসে যে হাড়শুদ্ধ কনকনিয়ে গেল! ছেলেগুলো হি হি ক'রে কাঁপছে! বাপরে বাপরে!

তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া হরপ্রসাদ বলিল – আর ঘুমোয় না, ওঠ না, বেলা হয়েছে। ছেলেরাও বরং উঠে একটু বেড়িয়ে আসুক।

—হ্যাঁ, শাল দোশালার ত অভাব নেই—গায়ে দিয়ে বেড়িয়ে আসবে! ওই ত একটা ক'রে রদ্দি গরম জামা—নামেই গরম, ওই প'রে যাক, গিয়ে বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাণ্ড বাধিয়ে আমার মুণ্ডুপাত করুক।

হরপ্রসাদ চুপ করিয়া রহিল। ছায়া এবার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিল —নাও, জানালাটা খোল দেখি, কি ভাঙলে একবার দেখি! খোল না!

হরপ্রসাদ জানালাটা সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত করিয়া দিল। সৌভাগ্যটা ছায়ার অথবা হরপ্রসাদের সেটা সূক্ষ্ম বিচারসাপেক্ষ, সৌভাগ্যক্রমে কোন কিছুই ভাঙে নাই। ছায়া কিন্তু বলিল—আমার সাতপুরুষের পুণ্যির জোর যে কিছু ভাঙে-চোরে নাই। কিন্তু তুমি কি মানুষ বল ত, জীবনে শেষ রাত্রের ঘুম যে কি আরামের তা একদিন ঘুমিয়ে দেখলে না? সমস্ত জীবনটাই পড়ুয়া ছেলের মত ভোর রাত্রে পড়া মুখস্থ করা। তাও যদি পাঁচ পাঁচবার এম-এ ফেল না হতে।

হরপ্রসাদের আর সহ্য করিবার শক্তি ছিল না, সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ছায়া কিন্তু ক্ষান্ত হইল না, সে আপন মনেই বলিয়া চলিল—পাঁচবারে কম করে পাঁচশ টাকা জলে গেল! যদি মানা করব ত চল্লিশ বছরের বুড়োর চোখ দিয়ে নোনাপানি ঝরতে আরম্ভ করবে!

বাহিরে তখন বেশ আলো ফুটিয়াছে। হরপ্রসাদ ইতিহাসের নোটখানা লইয়া বসিল।

এইবার চশমা দরকার, দৃষ্টিশক্তি সত্যই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বাড়ীর ভিতরে ছায়া তখনও বিষ ছড়াইতেছিল—সামনে মেয়ের বিয়ে! মানুষের যদি কোন চেষ্টা থাকে! আমি কিন্তু একখানি গহনা চাইলে দেব না। ওই পাঁচ শো টাকা থাকলে আজ মেয়ের বিয়ে নিয়ে এত ভাবতে হয়!

হরপ্রসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। জীবনে ঐ এক দুর্ভাবনা। বল্লাল সেন—কৌলীন্য!···ঝুনু অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে, চৌদ্দ-বৎসর পার হইয়া পনেরোয় পা দিয়াছে। বাল্যকালে ঝুনুকে যে দেখিয়াছে সে-ই বলিয়াছে, এ মেয়ের জন্য রাজপুত্র নিজে আসিয়া সাধিয়া বরমাল্য লইবে। ঝুনু সত্যই সুন্দরী মেয়ে। সাধ করিয়া হরপ্রসাদের মা ঝুনুর পায়ে তোড়া গড়াইয়া দিয়াছিলেন—আদর করিয়া বলিতেন, রাঙা পায়ে সোনার নূপুর রুনুঝুনু বাজে। সেই রুনুঝুনু হইতে তাহার নাম ঝুনু। ঝুনুর ভাগ্যফলও নাকি খুব ভাল। যে তাহার রক্তাভ করতলখানি দেখিয়াছে সে-ই সে কথা বলিয়াছে।

কিন্তু সব মিথ্যা, ভাগ্য অ-দৃষ্ট, গণনা অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। History repeats itself—বাঙলার কুলীনের ঘরের মেয়ের ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হইতে চলিয়াছে।

তবে মেজর গুপ্তের অ্যাসিষ্টাণ্ট ছেলেটি যদি হয়—হোক ছোট ডাক্তার সংসারে নিরাশ্রয়,—তবুও ঝুনুকে ভাগ্যবতীই বলিতে হইবে।

খাইতে বসিলে সে কথাটা ছায়াও মনে করাইয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের

কথা, এ ছায়া যেন সে ছায়াই নয়—সে যেন অকস্মাৎ মায়ামমতা-পরিপূর্ণা কায়াময়ী হইয়া উঠিয়াছে। হরপ্রসাদ কিন্তু বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইল না; কারণ তাহাদের জীবনে এইটাই স্বাভাবিক। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের জীবনে বিরোধ নামিয়া আসে দুঃস্বপ্নের মত।

ছায়া বলিল—আজ একবার ছেলেটির খোঁজ করে আসবে, কেমন?

হরপ্রসাদ উত্তর দিল—হ্যাঁ, সে কথা আমিও ভাবছিলাম। সন্ধ্যেবেলায় যাব।

ছায়া ম্লান হাসিয়া বলিল—বেশ, সন্ধ্যেবেলা পড়ার ভূত আবার ঘাড়ে চাপবে না ত?

—না। তা ছাড়া মেয়ের বিয়ের আগে ত পড়া নয়।

—তা দিনের বেলাতে গেলেই পার।

—ছেলেটির কর্ত্তা হলেন মেজর গুপ্ত। তিনি সায়েব মানুষ, বড় ডাক্তার তাঁর সময় বুঝে ত যেতে হবে।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পড়াশোনাও আর বাদই দিলাম। কি হবে মিথ্যে পরিশ্রম করে? পাঁচবার ত হ'ল—আর কেন?

ছায়াও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমারই অদৃষ্ট, তোমার দোষ কি বল? তুমি ত চেষ্টার কসুর কর নি। আজ সতের বছর বিয়ে হয়েছে আমার, একদিনের জন্যে বারোটা একটার আগে তুমি বিছানায় শুলে না, আর তিনটের পর বিছানায় থাক নি! বইএর পাতায় আর মুখে! সমস্তই আমার অদৃষ্ট।

সত্য কথা। হরপ্রসাদের অধ্যবসায়ের ত্রুটি নাই। আই-এ পাস্ করিয়া সে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিল—তারপর প্রাইভেট পড়িয়া বি-এ পাস করিয়াছে—সেও চারবারের ব্যর্থ উদ্যমের পর পঞ্চম বারে। তারপর পাঁচবার এম-এ হইয়া গেছে।

খাইয়া উঠিয়া হরপ্রসাদ বাহিরে আসিল ছেলেদের খোঁজে। এখন বড়দিনের ছুটি—একটুখানি নজর না রাখিলে তাহারা সমস্ত দুপুরটা হৈ-হৈ

করিয়া ফিরিবে। বাহিরে রাস্তার ধারে বারান্দায় ছেলেদের সাড়া পাওয়া গেল। হরপ্রসাদ সেখানে আসিয়া শুনিল—ছেলেদের মধ্যে তখন মোটরকার লইয়া আলোচনা চলিতছে।

—সুন্দর মোটরখানা, না দাদা? 3245 নম্বর।

দাদা উত্তর দিল—এখানকার মধ্যে সবচেয়ে ভাল মোটর হচ্ছে—সিটির শেঠজীর—রোল্‌স্‌রয়েস্—ত্রিশ হাজার টাকা দাম—নম্বর হ'ল 1627—

হরপ্রসাদ বলিল—1627! বলতে পার মণ্টু 1627 A. D. Indian Historyতে কিসের জন্য বিখ্যাত?

মণ্টু পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ভারতের ইতিহাস খুঁজিতে আরম্ভ করিল। হরপ্রসাদ বলিল—এস, সব ঘরের মধ্যে এস। ইতিহাসের গল্প বলব।

ঘরের মধ্যে বসিয়া হরপ্রসাদ বলিল—পারলে না বলতে? এ অত্যন্ত অন্যায়! দেখ, মন দিয়ে না পড়লে এই হয়। A great man—A great king—বিখ্যাত রাজা এই বৎসর জন্মগ্রহণ করেছিলেন।...তবু পারলে না?

ক্রমশ সে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল,—আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাই, তুমি ইতিহাসে পাশ হও কেমন ক'রে! নিশ্চয় তুমি চুরি কর। I am sure—তুমি কখনও ম্যাট্রিক পাস করতে পারবে না! ছত্রপতি শিবাজীর নাম তুমি মনে করতে পার না! Chhattrapati Sivāji was born in 1627. From the humble position of a Mawali Sardar he rose to be the master of an independent kingdom. He must be reckoned as one of the greatest heroes of Indian history.

ছোটরা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, একজন বলিল—গল্প বলবেন না?

—গল্প? হ্যাঁ, সেই ত বলছি। ভারতবর্ষে তখন মোগল-রাজত্ব। সম্রাট শাহজাহান তখন দিল্লীর সম্রাট। তাজমহলের নাম শুনেছ? শুনেছ! আচ্ছা! সেই তাজমহল তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন over the grave of

bis beloved queen Mumtaz Mahal—Tajmahal is the finest of all buildings of the world—a veritable wonder of the world. শুধু তাই নয়—শাজাহান আরও অনেক ভাল ভাল বাড়ী তৈরী করেছিলেন, মতি মসজিদ, জুম্মা মসজিদ, দেওয়ানী খাস—একটা নূতন শহরই তিনি নির্ম্মাণ ক'রে গেছেন শাজাহানাবাদ নাম দিয়ে। বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন—এ কি, এটা যে ঘুমিয়ে পড়ল! ওটাও ঢুলছে!

যাহারা জাগিয়া ছিল, তাহাদের একজনে সভয়ে বলিল—শিবাজীর কি হ'ল বাবা?

—হ্যাঁ বলি। মোট কথা the artistic achievement of the Mughals reached its high water-mark of greatness and glory during his reign—মানে শাজাহানের। আচ্ছা শাজাহান আর আকবরের চরিত্র তুলনা ক'রতে পার তুমি মণ্টু? আকবর ছিলেন the greatest of the Mughal Emperors—an Empire-builder—চোদ্দ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় কানানৌর নামক স্থানে তাঁর 'করোনেশন' হয়—১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। জন্ম হয়েছিল ১৫৪২-এর ২৩শে নবেম্বর অমরকোট শহরে। তাঁর বাপ হুমায়ুন তখন রাজ্য হারিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পাঠানবীর শেরশাহ তখন দিল্লীর সম্রাট হয়েছেন। তাঁর বাড়ী ছিল কোথায় জান?—সাসারাম। এই আরা জেলায় সাসারাম ব'লে একটা জায়গা আছে। আরা থেকে সাসারাম পর্য্যন্ত একটা লাইট রেলওয়ে আছে—সেই সাসারামে সামান্য একজন জমিদারের ছেলে ছিলেন শেরশাহ, বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল ফরিদ।

প্রবল উৎসাহের সহিতই ইতিহাসের আলোচনা চলিতেছিল। বেলা তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, ঝুনু আসিয়া আলোচনায় বাধা দিল। হরপ্রসাদ তখন মুসলমান রাজত্ব শেষ করিয়া হিন্দুরাজত্বের দ্বারে করাঘাত করিতেছিল। তিরৌরির দুইটা যুদ্ধ পার হইয়া সংযুক্তার স্বয়ম্বর-কথা হরপ্রসাদ বলিতেছিল,

দ্বাদশ শতাব্দীর—মানে Twelfth Century A. D.র মধ্যভাগে কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর-সভাও আহ্বান করেন। কিন্তু—

ঠিক সেই সময়েই ঝুনু আসিয়া বলিল—আজ ত আপনি পড়াতে যাবেন না বাবা?

চকিত হইয়া হরপ্রসাদ বলিল—কে বললে?

—মা বললেন।

একটু চিন্তা করিয়া হরপ্রসাদ বলিল—না, কাল ১লা জানুয়ারী New year's day, কাল যাব না। আজ যেতে হবে।

ছায়া নিকটেই ঘরের মধ্যে ছিল, সে এবার আসিয়া বলিল—গুপ্ত সায়েবের ওখানে যাবে বলেছিলে যে?

হরপ্রসাদের মনে পড়িয়া গেল—হ্যাঁ-হ্যাঁ! কিন্তু কাপড়চোপড়গুলো একটু…।—সে নিজের কাপড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল।

ছায়া বলিল—সে সব আমি ঠিক করে রেখেছি। ঝুনু মা, তোমার বাবার জুতোটা একটু পরিষ্কার ক'রে, কালি দিয়ে বুরুষ ক'রে দাও ত।…পয়সা কত দেব? একটা টাকা দিয়ে দিই। গুপ্তসাহেবের বাড়ীর একটু আগে থেকেই একখানা গাড়ী ক'রে নেবে, বুঝলে?

কথাটা হরপ্রসাদের মন্দ লাগিল না। কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা আছে। কে যেন নিষ্ঠুরতার সহিত পরিহাস করিয়া সমস্ত আয়োজন পণ্ড করিয়া দেয়। কাপড়চোপড় বদলাইয়া হরপ্রসাদ বাহির হইয়া খানিকটা গিয়াছে, এমন সময় মণ্টু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—মা বললেন টাকাটা ফিরিয়ে দিন।

হরপ্রসাদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মণ্টু বলিল—রমণীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা এসেছেন; জলখাবার আনাতে হবে—মা বললেন, আপনার কাছে টাকা চেয়ে নিতে।

রমণীবাবু হাইকোর্টের উকিল, তাঁহার গৃহিণীর সহিত ছায়ার প্রীতিসদ্ভাব আছে।

হরপ্রসাদ টাকাটা মণ্টুর হাতে দিয়া মাথা হেঁট করিয়া পদব্রজেই অগ্রসর হইল।

মেজর গুপ্ত খাঁটি সাহেব, ঢিলা পাজামার উপর গরম ড্রেসিং গাউন পরিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। হরপ্রসাদ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গুপ্ত সাহেব বলিলেন,—Well, এসেছেন আপনি! কিন্তু কি নামটি আপনার বলুন ত?

সবিনয়ে হরপ্রসাদ বলিল—আজ্ঞে—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—ব্যানার্জ্জী! সৌরীন হ'ল চ্যাটার্জ্জী, তা হলে ত বিয়ে হতে পারে, good!

হরপ্রসাদ আশান্বিত হইয়া বলিল—আপনার অনুগ্রহ হলে—

বাধা দিয়া গুপ্ত সাহেব বলিলেন—অনুগ্রহ কী আছে এতে? অনুগ্রহের কথা মোটেই নয়।

হরপ্রসাদ চুপ করিয়া রহিল, সঙ্গত উত্তর কি তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না।

গুপ্ত সাহেবই আবার বলিলেন—কি করেন আপনি?

—আমি স্কুলে শিক্ষকতা করি।

—শিক্ষক—Teacher? কোন্ teacher আপনি? কত মাইনে?

—আমি 2nd Assistant, ষাট টাকা মাইনে পাই।

—হুঁ। গুপ্ত সাহেব খানিকটা চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন—কি দিতে পারবেন আপনি?

হরপ্রসাদ এ প্রশ্ন প্রত্যাশা করে নাই, সে বিস্মিত হইয়া গেল। তবুও সবিনয়ে বলিল—আমার সাধ্য অত্যন্ত অল্প।

গুপ্ত সায়েব বলিলেন—আপনার সাধ্য আর সৌরীনের প্রয়োজন এই দুয়ে

একটা কম্প্রোমাইজ না হলে ত বিয়ে হতে পারে না। আপনি নিশ্চয় জানেন, সৌরীনের কেউ কোথাও নেই, বাড়ীঘর পর্য্যন্ত নেই, আমার charityতে মেডিকেল স্কুলে পড়েছে। এখন তার জীবনে একটা starting চাই! অন্তত দু হাজার টাকা—একটা ডিস্‌পেন্সারী করতে হাজার খানেক—আর গয়না and other expenses—এও হাজার টাকা, বুঝলেন ত!

হরপ্রসাদ বিহ্বলের মত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ, সে বুঝিয়াছে।

কিন্তু গুপ্ত সাহেব বোধ হয় সন্দেহ করিলেন। তাহার পরও তিনি পূরা দুইটি ঘণ্টা হরপ্রসাদকে সৌরীনের দুই হাজার টাকার প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—কেমন, পারবেন দিতে আপনি?

হরপ্রসাদ সবিনয়ে স্বীকার করিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই কোন রকমে দেব আমি। গুপ্ত খুশী হইয়া বলিলেন—Good, anyhow দিতেই হবে। উপায় কি? মেয়ে-জামাই ত আপনারই।

হরপ্রসাদ গুপ্তসাহেবের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া দেখিল পথে পথে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজপথের দুই পাশের দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার ঝক্‌মক করিতেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সহসা তাহার মনে হইল—সে করিয়াছে কি! দুই হাজার টাকা সে কোথায় পাইবে? বাস, এক্কা, মানুষের দ্রুত ধাবমান স্রোতের মধ্যে নিশ্চল হইয়া সে যেন ফুটা নৌকার মত তলাইয়া যাইতেছে!

—বঁচ যাইয়ে—বঁচ যাইয়ে বাবু! আঃ—কৈসন আদমী হায় আপ?

একখানা এক্কা প্রায় তাহার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল! হরপ্রসাদের যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে জনাকীর্ণ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার ধারে নির্জ্জন পথ ধরিয়া একটা প'ড়ো বাগানের মধ্যে আসিয়া বসিল। কতকালের পুরাতন বাগান—মধ্যে ভাঙা একটা চিমনী, বোধহয় কোন কালে মিল ছিল। চারিদিকে নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সে বসিয়া রহিল। রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে--ছায়া মূর্ত্তিমতী অশান্তির

মত তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার উপর এই দুই হাজার টাকার সংবাদ বহন করিয়া বাড়ী যাইবার সাহস তাহার নাই।

এ যুগ হিন্দু-যুগ হইলে রাজার দরবারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইলে—মহারাজ অশোক, মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন সর্ব্বস্ব, এমন কি পরিধেয় পর্যন্ত দান করিয়া ভিক্ষুর চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রাসাদে ফিরিতেন। হরপ্রসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সহসা একটা তীব্র আলোকে তাহার চোখ ঝলসিয়া গেল। বাগানটার পাশের রাস্তা দিয়া একটা মোটর আসিতেছে—তাহারই আলো। কত নম্বর—৫৬—নাঃ-নম্বরটাও দেখিতে পাওয়া গেল না, ৫৬, তারপর আর একটা অঙ্ক! তীব্র গতিতে মোটরটা স্থানটা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেছে!

স্থানটা আবার গাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিয়াছে। অন্ধকারে আকাশের দিকে চাহিতেই হরপ্রসাদ চমকিয়া উঠিল। দীর্ঘ স্তম্ভটা কাল-রেখার মত দাঁড়াইয়া আছে। সহসা তাহার মনে হইল ওটা ৫,৬,৭—পাঁচশো সাতষট্টি! অশোকস্তম্ভ, গৌতম বুদ্ধ—লুম্বিনী উদ্যান—। কিন্তু কই কোন সদ্যোজাত শিশু ত কাঁদে না? আকাশে অন্ধকার—পূর্ণচন্দ্র ত নাই! প্রসবযন্ত্রণা-কাতরা মহামায়া কোথায় বৃক্ষতলশায়িনী? হরপ্রসাদ আচ্ছন্নের মত বসিয়া রহিল।

কোথা হইতে যন্ত্রসঙ্গীতের ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছে। বোধ হয় ইউরোপীয়ান ক্লাব হইতে।—আজ রাত্রি বারোটা অবসানেই নববর্ষ আরম্ভ হইবে। রাজপথের কোলাহল আর শোনা যায় না। রাত্রি হয়ত অনেক হইয়াছে। হরপ্রসাদ চঞ্চল হইয়া এবার উঠিল। ওঃ, সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল! জনহীন রাজপথ। দ্রুতপদে সে বাড়ীর দিকে চলিল। মনকে সে শীতরাত্রির মত শীতল করিয়া তুলিতেছিল। ছায়ার রোষবহ্নি সব যেন সে হিমবর্ষণে নিভিয়া যায়। হে গৌতম বুদ্ধ! যুগে যুগে তোমার করুণা মানুষ পাইয়াছে, আমি কি পাইব না?

ও কি?—একটা গম্ভীর গর্জ্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল—শব্দটা এখনও গঙ্গার কূলে কূলে, রেলওয়ে ষ্টেশনের গতিহীন মালগাড়ীগুলায় ধাক্কা খাইয়া

খাইয়া ফিরিতেছে। আবার!—ও! বারোটা বাজিয়াছে, নববর্ষের তোপ পড়িতেছে! নববর্ষ তাহার জন্য কী আনিতেছে? দুঃখ—অভাব—অশান্তি —History repeats itself!

দরজায় হাত দিয়া দেখিল, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ! সে শঙ্কিত হইলেও নিরুপায় হইয়া ডাকিল—মণ্টু! ঝুনু!

দরজা সঙ্গে সঙ্গেই খুলিয়া গেল। ছায়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—এস! গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে এল। হাত পা ধুয়ে নাও। আমি ষ্টোভটা ধরিয়ে ময়দা মাখা আছে লুচি ভেজে দি।

নির্ব্বাক হইয়া হরপ্রসাদ ছায়ার অনুসরণ করিল। ছায়া আবার প্রশ্ন করিল—ওখানে কথা পাকা কর নি ত?

সভয়ে হরপ্রসাদ বলিল—দু হাজার টাকা চায়।

—দরকার নেই ওখানে। ঝুনুর আমার বরাত ভাল, আজ রমণীবাবুর বউ এসেছিলেন, তাঁর ভাইপো—ছেলেটি বি-এ পাশ—জমিদারী আছে, এক পয়সা নেবে না। ছেলেটি দ্বিতীয় পক্ষ। কোন ছেলেপুলে নেই, বয়সও বেশী নয়—তিরিশ। সে এখানে কখন এসেছিল—রমণীবাবুর বাড়ীতেই ঝুনুকে দেখে গেছে। নিজেই সে পিসীকে বিয়ের কথা লিখেছে। এখন তোমার মত হ'লেই পাকা হয়ে যায়।

হরপ্রসাদের চিত্তটাও আকস্মাৎ পুলকিত হইয়া উঠিল—সে উৎফুল্ল হইয়া ছায়ার দিকে চাহিল—ছায়া তখন ষ্টোভ জ্বালিতেছে। সে দেখিল ছায়া আজ সাজিয়াছে! সে আজ তরুণী হইয়া উঠিয়াছে।

সে বলিল—তোমাকে কিন্তু মানিয়েছে বড় সুন্দর!

ছায়া বলিল—কি মানুষ তুমি! এতক্ষণে বুঝি সেটা খেয়াল হ'ল? রমণীবাবুর বউ আমার চেয়ে বড়—তার সাজ যদি দেখতে! আর মেয়ের বিয়ে আস্‌ছে—একটু সাজ-গোজ ক'রে নিই! এমন আর কি বুড়ো হয়েছি আমরা! বলিয়া সে একটা কি আনিতে উঠিয়া গেল। কত কথা

হরপ্রসাদের মনে হইল! সুখ আর দুঃখ, দুঃখ আর সুখ—এতেই কত বৈচিত্র্য—ইতিহাসে এ বৈচিত্র্যের প্রাণ নাই।

হরপ্রসাদ আপন মনেই বলিয়া উঠিল—This is the history of individual life—every-day life, but it is never told—সুখ আর দুঃখ—it is always repeating itself—

—কি বকছ আপন মনে? ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল, সহসা কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া হরপ্রসাদ বলিল—ঝুনুর ত ভাল নাম হয় নি?

—না। কতবার তোমায় বলেছি! কিন্তু ভাল একটা নাম ওর আর হল না। এইবার একটি ঠিক কর, ঝুনু নামে তো বিয়ে হবে না!

মুহূর্ত্তে হরপ্রসাদের মন কোন্ অতীত লোকে চলিয়া গেল—সে বলিল—নাম থাকুক সুভদ্রাঙ্গী। নাতির নাম রাখবো অশোক।

রাধারাণী

কোথা হইতে আসিয়া পড়িল এক কালীয় দমন—অর্থাৎ কৃষ্ণ-যাত্রার দল। নিতান্ত বৈচিত্র্য-হীন অচঞ্চল পল্লী-জীবনের মধ্যে তাহাদের আবির্ভাবটা অনেকটা কোন কৃচ্ছ্রসাধনরত তপস্বীর সম্মুখে তপস্যা-ভঙ্গের জন্য প্রেরিত দেবমায়ার মত হইয়া উঠিল।

দলটা খুব বড় নয়, জন ত্রিশ-বত্রিশ লোক—তাহার মধ্যে জন দুয়েক ভারবাহী, একজন চাকর, একজন পাচক, বাকী সাতাশ আটাশ জন অভিনেতা। দক্ষিণে—ক্রোশ চারেক দূরের একখানা গ্রামে গান করিয়া তাহারা উত্তরমুখে চলিয়াছিল, কোথায় চলিয়াছিল সে কথা তাহারাই জানে। পথে এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামখানা পাইয়া গ্রাম-প্রান্তের একটা প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়াতলে আসর বিছাইয়া বসিল। নিকটেই একটা বড় পুকুর। বেলাও

তখন দু-পহর গড়াইয়া গিয়াছে। একজন রক্তচক্ষু দন্তুর প্রৌঢ় ভারবাহী দুইজনকে ও চাকরটিকে লইয়া স্থানটাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া উনান প্রস্তুত আরম্ভ করিয়া দিল। পাচক ব্রাহ্মণ ভারবাহীদের ভারের বোঝা খুলিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিল, একটা এ্যালুমিনিয়মের ডেকচী, একখানা কড়াই, তারপর একটা টিনের মগ—একটার পর একটা, বাজীকরের ঝুলির ভিতরের ছোটখাটো নানা টুকি-টাকির মত। বাকী সকলে পুকুরে মুখ-হাত ও হাঁটু পর্য্যন্ত পথের ধূলা ধুইয়া আসিয়া বটগাছটার ছায়াতলে খানকয়েক পুরাণো মাদুর ও চট বিছাইয়া গড়াইয়া পড়িল। স্থান সঙ্কুলানের অভাবে জনকয়েক গামছা বিছাইয়া বসিল। দলের মধ্যে গুটি ছয়েক ছেলে, তাহারাই শুধু যেন এখনও ক্লান্ত নয়; শীর্ণ শরীর, তার উপর মুখ শুকাইয়া গেছে,—তবু তাহারা স্থানটা আবিষ্কারের জন্য চঞ্চল ব্যগ্র দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া নূতন কিছু খুঁজিতেছিল। চোখে চোখে ইসারাও চলিতেছে, ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে দুটি ছেলের মধ্যে একটা ঝগড়াও চলিতেছে।

রক্তচক্ষু প্রৌঢ়ই দলের ম্যানেজার। কংস, আয়ান ঘোষ, ভীম বা যে কোন রাজার ভূমিকায় সে অভিনয় করিয়া থাকে। লোকটার চেহারার মধ্যে একটা উগ্রতা—এবং রুক্ষতা আছে, একটা গাম্ভীর্য্যও আছে—দেখিয়া মনে ভয় হয়।

পশুপতি উঠি উঠি করিয়াও মধ্যে মধ্যে চোখ বুজিতেছিল; ম্যানেজার বেশ একটু গম্ভীরভাবেই বলিল—ওঠ, ওঠ! ওই দেখ মূলগায়েনের গাড়ী এসে গেল!

সত্যই মূলগায়েনের গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছিল; একখানা খোলা গাড়ীর উপর গোটাচারেক বড় বড় কাঠের সিন্দুক-জাতীয় বাক্সের উপর ছাতা মাথায় দিয়া মূলগায়েন বসিয়া ছিল,—তাহার সঙ্গে দুটি সুশ্রী ছেলে। মূলগায়েনই দলের অধিকারী এবং পালাগানেও সে-ই অধিনায়কত্ব করিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সে-ই হয় বৃন্দাদূতী—নন্দগোপের গৃহাঙ্গনের দৃশ্যে সে ই হয় আবার যশোদা, সে কখনও হয় দাসী; কখনও সখী,

কখনও রাণী—একই বেশে সে সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে মূল অংশ অভিনয় করিয়া যায়। পালাগানের কঠিন এবং গভীর ভাবাত্মক গানগুলি সে-ই প্রথমে ধরতা ধরে। লোকটির বয়স যে কত সেটা বলা কঠিন, তবে ছোটখাট মানুষটি, বেশ সুশ্রী—সর্ব্ব অবয়বের মধ্যে একটি কমনীয়তা আছে। তাহার সঙ্গের ছেলে দুইটির একটি সাজে রাধা, অপরটি কৃষ্ণ।

পশুপতি আর বিলম্ব করিল না, সে ভারবাহী দুইজনকে লইয়া গ্রামের বাজারের ঠিকানায় বাহির হইয়া গেল। মূলগায়েন গাড়ী হইতে নামিয়াই প্রসন্ন মুখে বলিল, সংসার যে পেতে ফেলেছেন দেখছি ঘোষালমশায়! সাধে কি আর ব্রাহ্মণকে দেবতা বলেছে—প্রসন্ন দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেইখানেই মালক্ষ্মীকে এসে ভাণ্ডার খুলে বসতে হবে।

ম্যানেজার ঘোষাল প্রসন্ন হইতে সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, সে গম্ভীর-ভাবে আদেশ করিল, ওরে রাধু, পাত সতরঞ্চিটা পেতে ফেল, হাত পা ধোবার জল নিয়ে আয়। ঠাকুর—সরবত তৈরী কর দেখি।

মূলগায়েন বলিল,—আপনাদের জল খাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ, সে পথেই নদীর ঘাটে সেরে নিয়েছে সব।

—তা বেশ! আমার সখী-সখাকে জল খাইয়েছি পথে। বলিয়া সস্নেহে রাধা ও কৃষ্ণ—ছেলেদুটির দিকে চাহিল। তারপর একটু চিন্তা করিয়া আবার বলিল,—সেও তো অনেকক্ষণ হ'ল ঘোষালমশায়! আমি বলি কি—সের খানেক বাতাসা—; ম্যানেজার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—দাঁড়ান মশায়। ওদিকে আবার সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই লেগেছে। সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। কিছু দূরেই সেই ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে বিবদমান ছেলে দুইটা কখন নিঃশব্দে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। চীৎকার করিলে ম্যানেজার বা দলের লোক জানিতে পারিবে, যুদ্ধে বাধা দিবে—তাই তাদের এ নিঃশব্দ যুদ্ধ।

ম্যানেজার আসিয়া দাঁড়াইতেই ছেলে দুইটা পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া

অতৃপ্ত ক্রোধভরে বন্য-পশুর মত শুধু শ্বাসে-প্রশ্বাসে ফুলিতে আরম্ভ করিল। একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া ছেলে দুইটার পিঠে সপাসপ ঘা-কতক করিয়া দিয়া ম্যানেজার ছেলে দুইটাকে দুইটি পৃথক স্থানে বসাইয়া দিল। মূলগায়েন বলিল, হরিদাসকে বাজারে পাঠালাম ঘোষালমশায়; নিয়ে আসুক একসের বাতাসা। দু-খানা ক'রে মুখে দিয়ে একটু জল খাবে সব।

ম্যানেজার বলিল—দেখুন, এতে রেওয়াজ খারাপ হয়। আজ দিলেই কাল বলবে আমাদের বাতাসা দেওয়া হোক। আপনার কাছে তো কেউ যাবে না, জ্বালাবে সব আমাকে! এই দেখ—আজ বাতাসা মূলগায়েন নিজে হ'তে দিলেন। তা ব'লে—রোজকার রোজের কোন সঙ্গ নাই এর সঙ্গে।

সেই ছেলে দুইটা ফুলিয়া তখনও কাঁদিতেছিল—ম্যানেজার অকস্মাৎ তাহার বড় বড় দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া কট্ কট্ শব্দ করিতে করিতে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল,—কদ—লী বন দল-নের জন্য, মদ-মত্ত হস্তীকে আর বারংবার অঙ্কুশাঘাতে জাগ-রিত করতে হবে না। চোপ—বলছি চোপ! কাঁদবি ত' ছেলেকে ওই ভাতের হাঁড়িতে সেদ্ধ ক'রে খেয়ে নেব আজ! তাহার রক্তবর্ণ চোখের তারা দুইটা বন-বন করিয়া চরকীর মত ঘুরিতেছিল।

ছেলেগুলি এবার খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মূলগায়েনও মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—বেশ ভাল ক'রে একটা পান দাও তো সখি!

ম্যানেজার বলিল—রাধে, আমার জন্যেও একটা।

রাধার ভূমিকার ফুটফুটে ছেলেটি মূলগায়েনের পানের বাটা লইয়া কিশোরী মেয়ের মতই পান সাজিতে বসিল।

বাতাসা ভিজাইয়া জল খাইয়া ছেলেগুলাও শান্তভাবে শুইয়া পড়িল। মূলগায়েন স্নান করিয়া তিলক কাটিয়া নির্জ্জনে জপ করিতে বসিল। ম্যানেজারের বিশ্রাম নাই, সে ঠায় রান্নার কাছে বসিয়া আছে।

—ওহে—জল দাও হে, জল—, ভাত পুড়ে যাবে, অ-ঠাকুর! বলিতে বলিতে সে নিজেই এক ঘটী জল ভাতের হাঁড়িতে ঢালিয়া দিল। জল দিয়া

উনানের কাঠগুলি টানিয়া বাহির করিয়া আগুন কমাইয়া দিল; তারপর সে নিজে তেল লইয়া মাখিতে বসিল।

কিছুক্ষণ পরই তাহার হাঁকে ডাকে নিদ্রাতুর দলটি সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। চান ক'রে নে সব! এই এই—ওহে শশী—ও শ্যাম—ওঠ হে—ওঠ সব। তখন তাহার নিজের স্নান হইয়া গেছে, লম্বা চৈতনের গোছাটা দুইহাতে টানিয়া গ্রন্থী দিতে দিতে সকলকে ম্যানেজার ডাক দিতেছিল।

একজন প্রৌঢ় আড়ামোড়া দিয়া উঠিয়া গান ধরিয়া দিল—'ঘুমিয়েছিলাম বাবুর বাগানে'! লোকটির কণ্ঠস্বর মিষ্ট, কিন্তু কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা অপেক্ষাও তাহার ভঙ্গিটি আরো চমৎকার! স্বরের কৌশলে এবং ভঙ্গিতে খুব দূর হইতে ডাক শুনিয়া সাড়া দেওয়ার ইঙ্গিতটা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

একজন তেল বিতরণ করিতে বসিল—প্রত্যেকের বরাদ্দ একপলা। তাহার পর স্নান। স্নানান্তে সকলেই একখানা করিয়া আয়না ও চিরুণী বাহির করিয়া বসিল। প্রসাধন পর্ব্বটাই দীর্ঘ। নানা ছাঁদে টেরীকাটা শেষ করিয়া সব পাতা লইয়া বসিয়া গেল। সেই গায়ক প্রৌঢ়টি বাঁ-হাতে খানিকটা মাটি খাল করিয়া তাহার উপর পাতা পাতিল। পাতাঢাকা খালটিতে তরল ডাল অধিক পরিমাণে ধরিবে!

আহারের পরই একজন গ্রামে গিয়াছিল। ইহারই মধ্যে কে যে কখন সন্ধান লইয়াছিল কে জানে, কিন্তু সঠিক সন্ধান তাহারা পাইয়াছিল। লোকটি রায়েদের বাড়ীর ভুলু রায়ের কাছে আসিয়া উঠিল। ভুলু রায়ের বয়স বৎসর চব্বিশেক; বেকার জমিদার-তনয়, আয় বাৎসরিক শতখানেক টাকা; কিন্তু তবুও সে এরণ্ডহীন দেশের মহাপাদপ, কায়া এতটুকু হইলেও ছায়ার ভণিতাটা তাহার বিপুল, লোকে না মানিলেও সে মাতব্বর সাজিয়া বসিয়া আছে।

ভুলু প্রথমটা একেবারেই গা-ঝাড়া দিয়া বলিল—ক্ষেপেছ! লোকের ঘরে চাল অভাবে হাঁড়ি চড়ে না, লোকে যাত্রা শুনতে পয়সা দেবে!

লোকটি বলিল—বেশ তো, একবার দেখুন—যদি না-ই হয়, তো আর কি করা যাবে!

—তা-দেখ, তোমরা নিজেই চেষ্টা ক'রে দেখ। ওই লক্ষপতি বাঁড়ুজ্জেরা রয়েছেন, ওই গাঁয়ের শেষে রায় বাবু রয়েছেন। তারপর—ও পাড়ার তো সবাই বাবু; লম্বা কোঁচা—দেখ চেষ্টা ক'রে!

—দেখুন দেখি, রায়বাড়ীর নাম হ'ল বনেদী-বাড়ি! সে বাড়ীতে না হ'লে আমরা চলেই যাব। আর আপনি চেষ্টা করলে কি-না হয় বাবু! তবে আপনি না হ'লে হবে না!

ভুলু প্রসন্ন হইয়া বলিল—কি নেবে আগে শুনি। দক্ষিণে কত?

—সে যা' হয় দেবেন; আপনাদের কাছে কি আমাদের কিছু বলা সাজে?

ভুলু হিসাব করিয়া দেখিল, গোটা পনের টাকা বেশ উঠিবে, দুই এক টাকা বেশী ওঠাই সম্ভব। সেটাকে সে পকেট খরচ খাতে রাখিয়া দিয়া হিসাব করিল, আসরের খরচ—আলো, পান-তামাক ইত্যাদিতে গোটা তিনেক টাকা লাগিবে; সুতরাং বারো টাকা দিতে পারা যায়।

আরও দুই টাকা এ দিক ও দিক বাদ দিয়া সে বলিল—এই দেখ, দশটি টাকা আর খোরাকী একমণ চাল—এই পাবে। পারো যদি তবে দল-বল নিয়ে চলে এসো; এই ন'টা নাগাদ গান জুড়তে হবে।

লোকটি হতাশ হইয়া বলিল—বাবু আমাদের দলের মাইনেটা দেন। বত্রিশ জন লোক—অন্তত ষোলটা টাকা দেন!

ভুলু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর একটি টাকা মেরে কেটে! তোমাদের আবার কালীয় দমনের দল, আর কেউ শুনতেই চায় না। সখের দল হ'লে বরং লোকে দিত চাঁদা খুশি হয়ে!

লোকটি বলিল—তাইতো! একটু ভাবিয়া লইয়া সে আবার বলিল, আচ্ছা এই দশ মিনিট পরেই আমি এসে খবর দিয়ে যাচ্ছি!

ভুলু রায় ত্বরিত-কর্ম্মা লোক—এবং বিজ্ঞতাও তাহার এই বয়সে যথেষ্ট

হইয়াছে বলিয়াই সে মনে করে। ওই এগার টাকাই দলটির পক্ষে 'পড়িয়া পাওয়া চৌদ্দ আনা' এ কথা সে বেশ জানে। সে পাড়ায় বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই সে আসিয়া উঠিল 'উরু' দাদার বাড়ী। 'উড়োনচণ্ডী' হইতে সংক্ষিপ্ত হইয়া 'উরু'তে পরিণত লোকটির পরিচয় নামেই বিদ্যমান ; সে থিয়েটারে পার্ট করে, স্থাবর অস্থাবর বেচিয়া কলিকাতায় যায়, বেশ গোলগাল চেহারা, মাথায় একটি টাক—সে বলে, ও আমার টাকার টাক নয়, ফাঁকার টাক—সুখটাক নয়, দুখটাক।

—কি করছ উরুদা ?

—এই বসে বসে তামাক খাচ্ছি—আর তক্তা বাজাচ্ছি। বললাম তো'দিগে—যে, একখানা বই ধরে রিহারশাল বসিয়ে দে—তা'—হুঁঃ! পচে মরগে তোরা !

—সে হবে। এখন একটা যাত্রার দল এসেছে ; কি করি বল দেখি !

—যাত্রা ? তা' দে লাগিয়ে দে।

—কিন্তু ষোল টাকার কম যে কিছুতে ঘাড় পাতছে না। কাঁদাকাটা করছে। বলছে—দলের মাইনেটা পুষিয়ে দেন !

—বেশ, আমি একটাকা দোব। তুই আর সব দেখ।

—তা হলে আসরের ভারটা কিন্তু তোমাকে নিতে হবে !

—তা সব ঠিক করে দোব। দাঁড়া আলো এখুনি দেখে আসি—কুমারীশ ময়রার আলোটা ঠিক করতে বলে আসি। ওর ডে লাইটটা খুব ভাল। উরুদা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া রওনা হইল। ভুলুও বাহির হইয়া যাইতেছিল—উরুর স্ত্রী তাহাকে ডাকিল—শোন-শোন, ও ঠাকুরপো! ভুলু ফিরিল, উরুর স্ত্রী বলিল—এই দেখ, আমি ভাই আলাদা চাঁদা দোব চার আনা ; করাও যাত্রা ! মেয়ে মহলে সবাই দেবে !

অতঃপর ভুলু গিয়া উঠিল শূলপাণির বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে বুঝিল তাহার আসা ভুল হইয়াছে। বাড়ীতে তখন তুমুল কলহ। বড়

বৌয়ের পাঁচবৎসরের কন্যা—সেজ বৌয়ের কোলের মেয়ের দুধতোলা দেখিয়া ঘৃণায় বমি করিয়া ফেলিয়াছে—সেই হেতু কলহ! ভুলু ফিরিতেছিল, শূলপাণির ছোট ভাই নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ছিল—সে ভুলুকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল—ফিরলে যে!

—এসেছিলাম—তা'—; একটু নীরব থাকিয়া সে বলিয়াই ফেলিল—একদল যাত্রা এসেছে। তাই, চাঁদা ক'রে—যদি হয় একরাত্রি, তাই—তা—।

—তা বেশ তো, হোক না একরাত্রি—চাঁদা দোব আমরা। বেশ!

বড় বৌ মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—'ঘরে ভাত নাই—বাইরে রোশনাই'—সেই বিত্তান্ত! লোকের তো সিন্দুকে টাকা ধরছে না, তাই চাঁদা করে যাত্রা করাবে।

মেজ বৌ বলিল—আমি ভাই আট আনা দোব।

সেজবৌ বলিল—একটা টাকাই দাও দিদি! আমি তো আট আনা পাব!

—সে ভাই আজ হবে না। এই আট আনাই আমাকে ধার করতে হবে। সেজবৌ আজ মেজবৌয়ের প্রতি প্রসন্নই ছিল—সে বলিল তা হ'লে আমিই এক টাকা দিই। তুমি আমাকে এক টাকাই দিয়ো। বড়বৌ ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ভুলু, এই নাও ভাই। সবাই যখন দেবে তখন আমরাই বা না দিলে হবে কেন? আমার ভাই এক টাকার দলে নাম নিকো খাতায়! আর ভাই; সকালে আরম্ভ করিয়ো হ্যাঁ!

ছোট ভাই বলিল—তবে আমারটাও নিয়ে যা।

ভুলু বলিল—একখানা সতরঞ্চি দিতে হবে কিন্তু আসরের জন্যে।

—বেশ, লোক পাঠিয়ে দিস।

কিছুক্ষণ পর ছোট ছেলের দল বস্তা ঘাড়ে চাল আদায় করিতে আসিয়া বলিল—চাল দাও গো যাত্রার।

একদল মেয়ে আসিয়া বলিল—বড়বৌ, চল যেতে হবে তোমাকে।

আশ্চর্য্য হইয়া বড়বৌ বলিল,—কোথায় ?

—পদ্মকাকী চাঁদা দেয়নি। কেন দেবে না ? চল যেতে হবে!

সঙ্গে সঙ্গে বড়বৌ উঠিল, বলিয়া গেল,—মেজবৌ দেখিস তো ভাই, আমার ভাতটা না পুড়ে যায়! চল।

লোকটি নিবেদন করিল,—এগার টাকা আর একমণ চাল, এর ওপর আর কিছুতেই উঠল না।

ম্যানেজার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—দলের মাইনেই তো বারো টাকা! এক টাকা কি আমার গাঁট থেকে দেব না কি ?

আসন্ন সন্ধ্যার বিষন্নতার মধ্যে একখানি পূরবী রাগিণী ধরিবার জন্য বেহালাদার বাক্স হইতে বেহালাখানি বাহির করিয়া সুর বাঁধিতেছিল, সে বলিল—বসে থাকলে তো কেউ কিছু পাবে না। ব'সে থাকি, না, ব্যাগার খাটি, কিছু কমই না হয় নেবে সবাই। সিকি বার আনা ক'রে দেন, বার সিকি তিন টাকা বাদ দিয়ে ন'টাকা মাইনে—তিন টাকা থাকবে।

ম্যানেজার বলিল—তা হলে তুমিই দেখ ওস্তাদ; বলে কয়ে দেখ সব। আমি মূলগায়েনকে বলে দেখি। ঘুমালো নাকি মূলগায়েন ?

মূলগায়েন ঘুমায় নাই—নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়া ছিল। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, এই গ্রামে সে বৎসর-বৎসর যাত্রা করিতে আসিত। তাহার গুরু—অধিকারীর দলে সে তখন সাজিত রাধা। মনে পড়িয়া গিয়াছে!

ম্যানেজার আসিয়া ডাকিল—ঘুমালেন না কি গো!

চোখ মেলিয়া মৃদু হাসিয়া মূলগায়েন উত্তর দিল—বলুন।

—এরা যে এগার টাকার বেশী দিতে চায় না গো!

—তা হলে ?

—সেই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। ওস্তাদ বলছে যে বসে থাকার

চেয়ে দলের লোকে মাইনেও কিছু কম নিক—আপনারও কিছু কম থাক। হয়ে যাক ওতেই।

—বেশ। তাই হোক।

ম্যানেজার চলিয়া গেল। মূলগায়েন আবার চোখ মুদিয়া নিস্তব্ধ হইল। তাহার মনোলোকে জাগিয়া উঠিল স্মৃতির ছবি।

ছোট দশ বারো বৎসরের কমনীয়কান্তি একটি ছেলে, দর্পণে দেখা সে রূপ এখনও তাহার মনে আছে। কেমন করিয়া কোথা হইতে সে যে যাত্রার দলে আসিয়া জুটিয়াছিল, সে জানিতেন পূর্ব্ব অধিকারী। অধিকারীর ঘরেই স্নেহ মমতার মধ্যেই সে বাস করিত। সন্ধ্যায় গান শিখিত—অধিকারী পাখীর মত তাহাকে শিখাইতেন, বৃন্দা প্রশ্ন করিত—

—বলি হ্যাগো শ্রীমতী, ব্রজেশ্বরী, ব্রজের রাণী তুমি, তোমার চোখে জল কেন গো?

সে সুর করিয়া ঝোঁক দিয়া উত্তর দিত—বৃন্দে গো! পীরিতির রীতি এমন কেন বল্‌তে পার সখি?

—কেমন সে রীতি বল দেখি? আমি তো জানি না, বল তো শুনি?

—পীরিতি এত দুঃখময় কেন সখি?

—দুঃখময়? না-না তা কি হয়! পীরিতি তো সুখের সায়র গো!

—না, না সখি—পীরিতি বড় দুঃখময়! বলিয়া সে গান ধরিত—'পীরিতি সুখের সায়র দেখিয়া নাইতে নামিনু তায়।'

যাত্রার আসরে মুখে অলকা-তিলকা আঁকিয়া বিচিত্র বেশ পরিয়া সে এমনি কথাগুলি বলিয়া যাইত। দেশ দেশান্তরের কত বিচিত্র আসর—সামিয়ানা—নাটমন্দির, কত আলো, কত জনসমাবেশ! এই গ্রামের বাঁড়ুয্যে বাবুদের প্রকাণ্ড নূতন নাট-মন্দিরের সে শোভা অপরূপ শোভা! তখন তাহার বয়স বারো।

সাজঘরের দুয়ারে গ্রামের ছেলেদের কত উঁকি-ঝুঁকি; তাহার সহিত

আলাপ করিতে তাহাদের কত ব্যগ্রতা! মধ্যে মধ্যে ওই ঘোষালের মত রক্তচক্ষু উগ্রদর্শন হরিশ ঘোষ তাহাদের তাড়া করিত, এই ধরতো ছেলের পালকে! খাব! খাব! ছেলেরা ছুটিয়া পালাইত! আসরে বসিয়া তাহারা পান ছুঁড়িত। সে সেদিকে তাকাইলে দেখিত দাতাও কৃতার্থ হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যাত্রা ভাঙিয়া গেলে অবশিষ্ট রাত্রিটুকুতে ঘুমাইয়া ঘুম শেষ হয় নাই—সকালে বসিয়া সে সাজঘরের বারান্দায় ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছিল। কানের মধ্যে তখনও যন্ত্রসঙ্গীতের রেশ যেন ভাসিয়া আসিতেছিল। বৃন্দা যেন ডাকিল—শ্রীমতি! রাধে! তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। স্বপ্ন নয়, একটী আট-নয় বছরের মেয়ে তাহাকে ডাকিতেছে—শ্রীমতী, রাধে।

—ধ্যেৎ, ছেলে! ইয়ার্কী করতে এসেছ? মেয়েটি ছুটিয়া কিছুদূর পলাইয়া গিয়া দাঁড়াইল।—তোমাকে ডাকছে।

—ভাগ! সে আবার চোখ বুজিল।

—শ্রীমতী! তোমাকে আমার মা ডাকছে গো!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে আবার আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মেয়েটি মিনতি করিয়া বলিল—আমার মা সন্দেশ তৈরী করেছে, তোমাকে ডাকছে। এস!

সন্দেশ! লুব্ধ ছেলেটি এবার না উঠিয়া পারিল না, দলের লোক জনকতক উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনে গিয়াছে, কতক তখনও অসাড় হইয়া নিদ্রামগ্ন; সে উঠিয়া মেয়েটির সঙ্গে চলিল। আঁকাবাঁকা পল্লীপথ—দুটি চারিটি লোক, কেহ যায় কেহ আসে।

—ওই দেখ রে, ওই কাল রাধিকে সেজেছিল! নয় হে ছোকরা?

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ওই, ওযে আমাদের বাড়ী চললো!

—তোমাদের কেউ হয় বুঝি?

—হ্যাঁ।

ছেলেটি বিপন্ন হইয়াও প্রতিবাদের সময় পাইল না। মেয়েটি এবার গতি

দ্রুততর করিল। ত্বরিতগতিতে আরও কয়টা ছোট গলি ঘুরিয়া ঘন বৃক্ষপল্লবে বেষ্টিত ছোট একটি আঙিনায় আসিয়া উঠিল। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের সুশ্রী মেয়ে উজ্জ্বল হাসিমুখে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল এস, এস—গোপাল এস। তোমার জন্যে আমি বসে আছি।

মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—দূর। গোপাল কেন হবে?—ও যে শ্রীমতী, রাধে।

মা তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল,—পাজী মেয়ে কোথাকার—দেখবি?

মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পালাইল। মা ছেলেটিকে সমাদর করিয়া বসাইয়া বলিল—মুখ হাত ধোওয়া হয়নি তো তোমার? গোপাল? বলিয়া নিজেই একটু তামাকের গুলগুঁড়া, একটি তালপাতা, একঘটি জল নামাইয়া দিল। তারপর প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ গোপাল, আমরা বোষ্টম; আমাদের ঘরে একটু জল খাবে তো?

ছেলেটি বলিল—আমিও বোষ্টম।

—বোষ্টম! মেয়েটির মুখ অনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাই তো বলি, বোষ্টম না হলে কি এমন সুন্দর রাধা হয়। একেবারে সাক্ষাৎ রাধা। তা হ'লে একটু জল খাও—কেমন?

ঘরের তৈরী ক্ষীরের নাড়ু বড় চমৎকার। কিন্তু আর চাহিতে তাহার লজ্জা হইল। সে তাড়াতাড়ি জল খাইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

—হ্যাঁ বাবা একটি গান শোনাবে?

—কি গাইব বলুন!

—ওই যে শ্যাম শুক পাখী—!

গুন্ গুন্ করিয়া ক্রমশ কণ্ঠ উচ্চতর করিয়া সে গাহিল—শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি—ধরিলাম নয়ন-ফাঁদে!

একটা নয়, আরও একটা গান শুনাইয়া, সে পান চিবাইতে চিবাইতে বাসায় ফিরিল।

সেই কয়জন অল্পবয়সী বাবু! তাহাদেরও আজ মনে পড়িতেছে তাহারা তাহাকে ডাকিয়া বলিল—এই ছোকরা, শোন!

—কি নাম তোমার?

—আজ্ঞে? সে কেমন ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল।

—তোমার নামটি কি?

—আমার নাম? আমার নাম গৌরদাস দাস।

—কোথায় বাড়ী তোমার?

—আজ্ঞে, আমার মা-বাপ কেউ নেই; আমি অধিকারী মহাশয়ের বাড়ীতে থাকি।

—মাইনে-টাইনে দেয়? না পেট-ভাতাতেই থাক?

সে চুপ করিয়া রহিল। একজন আবার বলিল—দেখ, আমাদের থিয়েটারের দল হয়েছে। আমাদের দলে যদি এস, তবে আমরা মাইনে দেব; মা-বাপ নেই বলছ—বাড়ী-ঘর ক'রে দেব, বুঝেছ!

—আজ্ঞে না। সখের যাত্রা বা থিয়েটার তাহার ভাল লাগে না, সেখানে রাধাকে নাচিতে হয়। এমন করিয়া বৃন্দা সেখানে রাধাকে ভক্তি করে না।

—কেন?

এবার সে ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা আর তাহাকে উত্যক্ত করিল না, হাসিয়া ছাড়িয়া দিল। বাসায় আসিয়া দেখিল—সেই মেয়েটি দাঁড়াইয়া আছে।

—শ্রীমতী!

এবার সে হাসিয়া ফেলিল। মেয়েটি বলিল,—মা ডাকছে।

সেই বৎসর হইতে বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর রাস-যাত্রায় তাহাদের দলের বায়না বাঁধা হইয়া গেল। বৎসরে বৎসরে সে দলের সঙ্গে আসিত। বিনা আহ্বানেই সে এখন সেই আখড়াতেই গিয়া ডাকিত—মা!

—কে, গোপাল—গৌরদাস! এস বাবা, এস। এই তোমার জন্তেই খাবার করছি। গোপাল ক্ষীরের লাড়ু বড় ভালবাসে—না বাবা?

সে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কলকণ্ঠে মেয়ে বলিয়া উঠিত—নাড়ুগোপাল! একবার হামাগুড়ি দিয়ে বস তো নাড়ু গোপাল!

—তোকে এইবার এক চড় মারব রাধু। মেয়েটির নাম রাধারাণী।

নয় হইতে দশ—দশ হইতে এগার, এগার হইতে বার বছরের মেয়েটি এখন অনেক শিখিয়াছে। সে গৌরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।

গৌর বলিল,—দেখুন—রাগ দেখুন!

রাধু তাহার অভিনয়-ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিয়া আরম্ভ করিল—না-না সখি—সে মুখ আমি আর দেখব না গো! কালো রূপ আর হেরব না। যমুনার জল কালো—যমুনায় আর যাবো না গো! মাথায় কেশ কালো—সে কেশ আর রাখব না সখি! নীলাম্বরীর বর্ণ কালো,—নীলাম্বরী আর পরব না গো! দাও দাও আমাকে গৈরিক বাস এনে দাও সখি, আমায় যোগিনী সাজায়ে দাও!

মা তাহার হাসিয়া বলিল,—মরণ তোমার! গৌরদাস অমনি করে বলে নাকি? আর গায় কত স্থন্দর—পারিস তুই?

—ছাই। ও আমি খুব পারি।

—বেরো, বেরো বলছি। পালা!

মেয়ে সত্য সত্যই পলাইয়া গেল।

মা বলিল—হ্যাঁ বাবা গোপাল, এইবার তো বড়টি হ'লে—এইবার একটা ঘরদোর কর। রাধুর বাবা বলছিল—গৌর যদি বড় দলে যায়—অনেক মাইনে হয়। তোমার ভাবনা কি বাবা!

গৌর বলিল—অধিকারী আমাকে ঘরদোর করে দেবেন, জমি কিনে দেবেন বলেছেন।

—হ্যাঁ বাবা, আমার রাধুকে বিয়ে করবে? আমার বড় সাধ।

গৌর সলজ্জ মুখে নত দৃষ্টিতে নীরব হইয়া রহিল। রাধারাণীর রঙ ফরসা না হউক এমন দেহভঙ্গি বড় দেখা যায় না। একটু দীর্ঘ তন্বী, পিঠে একপিঠ চুল, চোখের তারা দুইটি অহরহ চঞ্চল, কথা কহিবার সময় যেন নাচে!

গৌরের সলজ্জ নীরবতা দেখিয়া রাধারাণীর মা পুলকিত হইয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া সে বলিল—রাধুর বাপের সঙ্গে সেই কথাই হয় আমাদের। তারও ভারি ইচ্ছে। বলে কি জান, বলে—গৌরও আমাদের রাধারাণী সাজে, রাধুও আমাদের রাধারাণী—কেমন মিল হবে বল দেখি!···তা হ'লে আজ ওঁকে পাঠিয়ে দেব অধিকারী মশায়ের কাছে। অধিকারী মশায়ই তো তোমায় মা-বাপ সব!

গৌর চুপ করিয়া রহিল, খাইতে বসিয়া সলজ্জ কুণ্ঠায় পূর্ব্বের মত এবার আর চাহিয়া খাইতে পারিল না। রাধারাণীর মা অযাচিতভাবেই আরও কয়েকটা নাড়ু পাতে দিয়া বলিল—জামাই না হতেই লজ্জা আমার গোপালের।

আসিবার পথে নির্জ্জন গলির মধ্যে রাধারাণীর সঙ্গে দেখা হইল। রাধু তাহাকে দেখিয়া একপাশে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। গৌর বলিল—মান বুঝি? রাগ হয়েছে?

রাধু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জারক্ত মুখে ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—যাঃ! তারপর দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—আমি বুঝি শুনি নাই!

গৌরদাসের সমস্ত অন্তরটা আবেশময় পুলকোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল।

সমস্ত দিন সে উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, কখন রাধারাণীর বাপ আসিবে! কোন কিছু আর ভাল লাগিল না। গ্রামের ছেলেগুলি এখন বন্ধু হইয়া গিয়াছে; তাহারা পান আনে, সিগারেট দেয়। তাহারা আসিয়া আজ ফিরিয়া গেল।

রাধুর বাপ আসিল সন্ধ্যার দিকে। অধিকারীকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রভুর কাছে একবার এসেছিলাম আমি।

একখানা ছোট ঘরে অধিকারী, ম্যানেজার—দলের রাধা ও কৃষ্ণকে লইয়া থাকেন। স্বতন্ত্র তাঁর শয্যা ও আসন, ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। তিনি বাবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন,—কি, বলুন।

গৌরদাস ঘরের পিছন দিকের জানালায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জানালার ছোট একটা ছিদ্র দিয়া সবই দেখা যাইতেছিল।

হাত জোড় করিয়া সহাস্যে রাধুর বাপ আপনার নিবেদন সবিনয়ে ব্যক্ত করিয়া বলিল—এখন আপনার আদেশ না পেলে তো হয় না; আপনিই তো গৌরের সব—রক্ষক বলুন রক্ষক, বাপ বলুন বাপ—সবই আপনি।

অধিকারী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—প্রস্তাব কিছু অন্যায় প্রস্তাব নয়। তবে গৌর এখন ছেলেমানুষ,—বালক বললেই হয়। ছেলেটি ধরুন গান করেই খায়; কণ্ঠস্বর আর সঙ্গীতবিদ্যা হ'ল সাধনার বস্তু। সংযম নইলে সাধনা হয় না।

রাধার বাপ বলিল,—আমার কন্যাটিও খুব বড় নয়, এই আপনার বছর বারো হবে! আপনি অনুমতি করলে—এক আধ বছর পরেই না হয়—।

তাহার কথার মধ্যপথেই অধিকারী বলিলেন,—ম্যানেজার বাবু একবার বাইরে যদি যান দয়া করে তা হ'লে···দরজাটা একটু বন্ধ করে দিয়ে যাবেন। হ্যাঁ!

তারপর বলিলেন—দেখুন, আপনি হলেন বৈষ্ণব, আমি ব্রাহ্মণ, তার ওপর ভগবানের লীলাগান করাই হ'ল আমার ব্যবসা। আমি তো আপনাকে প্রতারণা করতে পারবো না। একটা কথা—

কিন্তু, কথাটা না বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন; নীরবেই মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রাধুর বাপও নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সে-ই উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবতা ভঙ্গ করিল,—প্রভু!

অধিকারী বলিলেন—বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে বাবাজী; এতদিন এ কথা গোপন করেই রেখেছি। কিন্তু আজ আপনি যে প্রস্তাব করছেন—তাতে

আপনার কাছে গোপন রাখা চলে না। দেখুন···একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অধিকারী বলিলেন—ছেলেটি জাতিতে বৈষ্ণব নয়!

—বৈষ্ণব নয়! তবে? রাধুর বাপ যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

—সকলে অবশ্য বৈষ্ণব বলেই জানে,—ছেলেটিও তাই জানে। আমি বরাবর ওই পরিচয়ই দিয়ে এসেছি। অনেকদিন পূর্ব্বে, ছেলেটির বয়স তখন ছয় কি সাত; সেই সময় বর্দ্ধমানের পথ থেকে ওকে কুড়িয়ে এনেছিলাম, ওর চেহারা দেখে আর গান শুনে। সেই বয়সেই গান গেয়ে ছেলেটি ভিক্ষা করে বেড়াত; আমার দলের জন্যে ওকে এনেছিলাম। দোকানীরা বলেছিল, ছেলেটির মা নাকি—। অধিকারী নীরব হইলেন।

বাবাজী ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করিল—মা নাকি?

—মানে কি বলব? এই নাচগান করত, মানে বারাঙ্গনা ছিল।

—বেশ্যা?

—হ্যাঁ, তাই।

পিছনের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া গৌর কেমন অবসন্ন বিবশ হইয়া গেল—সে যেন পঙ্গু হইয়া গেছে।

বাবাজীও স্তব্ধ হইয়া স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল। অধিকারী আবার বলিলেন—ছেলেটিকে এনেছিলাম প্রথমে স্বার্থের জন্যেই। কিন্তু এখন বড়ই মায়া হয়ে গেছে। নিজের কাছেই রেখেছি, রাধাকৃষ্ণের লীলায় ওকে রাধা সাজাই; সেই পুণ্যে ওর পাপ ধুয়ে মুছে যাবে বলেই আশা করি। ভাল ক'রে একটু অধিকার হ'লেই—আমি ওকে বৈষ্ণব ক'রে দোব। মহাপ্রভুর মহাধর্ম্মে তো জাতিকুলের বিচার বড় নয়—সে বাধাও নাই; তারপর দেখুন আপনি—

নিতান্ত অবসন্নের মত বার-কয়েক ঘাড় নাড়িয়া রাধুর বাপ জানাইয়া দিল—না—না—সে হয় না। আমরা জাত-বৈষ্ণব। ভেকধারী নই।

তারপর অধিকারীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সে বলিল,—আপনি মহৎ

লোক আপনি আমাকে জাতিপাত থেকে রক্ষা করলেন। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছিল।

গৌরের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী অর্থহীন; মাথার ভিতর যেন অসীম শূন্যতা নিঃশব্দ প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। বুকের মধ্যে শোকোচ্ছ্বাসের মত একটা যন্ত্রণাদায়ক আবেগ নির্দ্দয় ভাবে তাহাকে পীড়িত করিতেছে। মুহুর্মুহু তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল—বারবার মুছিয়া মুছিয়াও সে জল সে শেষ করিতে পারিল না। তাহার মা—! সে—! এবার সে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ দ্রুতপদে সকলকে এড়াইয়া নির্জ্জন পথ ধরিয়া গ্রামের বাহিরে আসিয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিল। সে কান্না তাহার আর ফুরায় না! তাহার মা—! সে— ছি-ছি-ছি! রাধু, রাধারাণীর কাছে সে অস্পৃশ্য!

সহসা একসময় অন্ধকার অনুভব করিয়া সে দাঁড়াইল। নির্জ্জন প্রান্তর—পিছনে অনেক দূরে উজ্জ্বল আলোগুলির উৰ্দ্ধোৎক্ষিপ্ত প্রভা অন্ধকার শূন্যলোকে জমাট সাদা কুয়াশার মত ভাসিতেছে। আশেপাশে সম্মুখে গ্রামের চিহ্নই অনুভব করা যায় না। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের অন্ধকার পথেই আগাইয়া চলিল। না—ছি-ছি!

কিন্তু রাধু? রাধুও হয়তো কাঁদিতেছে! সে আবার কাঁদিল।

তারপর? কত পথে, কত দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া কত বিভিন্ন যাত্রার দলে দলে ফিরিয়া সে নিজে দল গড়িল। নামটা পর্য্যন্ত সে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান তাহার বড় ভাল লাগে। সখের যাত্রার দল তাহার ভাল লাগে নাই, সেখানে রাধা গান গাহিয়া নাচে! ছিঃ রাধা অভিমানিনী, মর্য্যাদাময়ী রাজনন্দিনী, ব্রজসুন্দরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া সে কি নটীর মত নাচিবে! কত বড় প্রেম, কত বড়

সে বিরহ, কত দুর্ব্বার—সে অভিমান! ওরে আলোর সঙ্গে কি রঙের ভেজাল দেওয়া যায়! রাধা—রাধারাণী—রাধু—রাধু!

একখানি কিশোরীর মুখ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে বলিতেছে—না না সখি, সে মুখ আর দেখব না গো!...নীলাম্বরী আর পরব না সখি! দাও দাও আমায় গৈরিকবাস এনে দাও—যোগিনী সাজায়ে দাও! তাহার কৌতুকময় কণ্ঠ আজ যেন গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।...

এদিকে দলের মধ্যে তখন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সাজ-পোশাক লইয়া দল গ্রামের মধ্যে চলিয়াছে। বেহালাদার শশী বলিল,—মূলগায়েনের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাব না-কি?

কথাটা চুপি চুপি সে ম্যানেজার ঘোষালকে বলিল।

ম্যানেজার বলিল—বোধ হয় শুয়ে শুয়েই ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন! নাও-নাও সব গুছিয়ে-গাছিয়ে চল গাঁয়ের ভেতর। এই দেখ ভদ্দরলোকের গ্রাম—চ্যাংড়ামি যেন কেউ না করে! বুঝলে!

তারপর সে অধিকারীর কাছে আসিয়া সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাভরে ডাকিল—মূলগায়েন! ওঃ, আপনার ইষ্ট-স্মরণ হয়ে গেল দেখছি! তা শুয়েই—কি রকম হ'ল?

চোখ মুছিয়া মূলগায়েন বলিল—শরীরটা ক্লান্ত ছিল আর, স্মরণে আপনি উদয় হ'লে—মানে, মনে পড়লে কি মনে না-করে থাকা যায়?

—তা হ'লে চলুন গ্রামের মধ্যে। এরা সব চলে গেল।

—ভুলু রায় ও উরুদাদা আসরটা বেশ ভাল করিয়াই সাজাইয়াছিল। চারিদিকে চারিটা ডে লাইটে আসরটা আলোয় আলোয় যেন ঝলমল করিতেছে। সম্মুখে বসিয়া ছেলের দল, তাহার পিছনে একদিকে ভদ্রলোক, অপরদিকে অন্যান্য শ্রেণীর পুরুষেরা বসিয়াছে। পিছনে মেয়েদের আসর।

পালাটা হইতেছিল দীর্ঘ বিরহের পর রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলন—প্রভাসযজ্ঞ।

বিরহিণী রাধা দ্বারকার পথের সন্ধান করিতেছেন—কোন্ পথে গেলে দ্বারকায় শীঘ্র যাওয়া যায়।

এই সময়—এতক্ষণে মূলগায়েন আসরে প্রবেশ করিল। মাথায় পাটীপাড়া ধরণের পরচুলা, তাহাতে সিঁথী। সিঁথীর দুইটি শাখা চুলের রেখায় রেখায় বেড়িয়া কবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কানে কান, নাকে নথ, গলায় চিক ও সাতনর, হাতে কঙ্কণ, বাহুতে তাবিজ ও বাজুবন্ধ, পরণে বিচিত্র বেশ, কপালে তিলকবিন্দুর সারি, নাকে রসকলি আঁকিয়া সাজিয়া দূতীরূপে সে আসিয়া আসরে প্রবেশ করিল। দলের চাকরটি পিছনে পিছনে আসিয়া পানের বাটা, পরিপাটী ভাঁজ করা একখানি গামছা রাখিয়া দলস্থ একজনকে জিম্মা দিয়া গেল। পরম ভক্তিভরে মূলগায়েন প্রণাম করিয়া বসিয়া আসরের চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিল। আলোকিত আসরে সারি-সারি মুগ্ধ শ্রোতার মুখ। কিন্তু রাধারাণী কোথায়? চারিদিকে সে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু কই?

—উঠুন গো আপনি; গান জমেছে ভাল। আপনি উঠলে আসর আগুন হয়ে যাবে! পিছন হইতে ম্যানেজার ঘোষাল মৃদুস্বরে ইঙ্গিত দিল। সে উঠিয়া দীর্ঘ স্বর ছাড়িয়া ধরিল একখানি ধ্রুপদাঙ্গের গান। শিক্ষিত সুমিষ্ট কণ্ঠের রাগিণীর আলাপে আসর যেন ভরিয়া উঠিল।

পরদিন বিদায় লইয়া সে বাসায় ফিরিতেছিল, সঙ্গে ছিল দলের যে ছেলেটি রাধা সাজে সেই ছেলেটি।

বিদায়ের কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছিল—সেই উরুদাদা। ভুলু ছিল তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ডানদিকে বসিয়া। উরুদাদা বলিল,—নাঃ অধিকারীমশায়, মনে করেছিলাম কেষ্টযাত্রা ভাল লাগবে না, তা বেশ লাগল,—চমৎকার। যেমন আপনার গলা তেমনি শিক্ষা! সুন্দর! আর রাধা, যে ছেলেটি—এই যে এইটিই তো! বাঃ খাসা। ওর জন্যে আমরা এই আলাদা আটআনা দিলাম।

মূলগায়েন সবিনয়ে বলিল,—আপনারা মহৎ ব্যক্তি। গুণীর গুণ আপনাদের চোখে তো এড়াবে না। নাও রাধে, বাবুদের প্রণাম কর।

বিদায় লইয়া ফিরিবার পথে চলিতে চলিতে সহসা সে চমকিয়া উঠিল—একি, এ কোন্ পথে সে আসিয়াছে? এ তো সেই আখড়ার পথ! হ্যাঁ! এই তো! কিন্তু আখড়াটা কই? বোধ হয় এইটাই! উঃ গাছগুলি কত বাড়িয়া উঠিয়াছে! কুঞ্জবন যে বন হইয়া উঠিয়াছে!

—দাঁড়ালেন যে? ছেলেটি তাহার অনুসন্ধানরত বিচিত্র দৃষ্টি দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

একটু অপ্রস্তুত হইয়া মূলগায়েন বলিল—জল খাবে?

—না, আমার তো তেষ্টা পায়নি।

তবুও একবার উঁকি মারিয়া সে দেখিল; বনান্তরালে ঘরগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত, কেহ কোথাও নাই! বনের ছায়ার নিবিড় অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখাও যায় না, বনের ঝরা-পাতা পচিয়া একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধে স্থানটা পরিপূর্ণ। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিল; রাধু নাই! দুর্দ্দমনীয় একটা দুঃখের আবেগে বুকটা তাহার ভরিয়া উঠিল। দ্রুতপদে সে সেই চেনা গলিপথটা ধরিয়াই অগ্রসর হইল। কিন্তু চলিতে চলিতে তাহাকে বিব্রত হইয়া দাঁড়াইতে হইল। নাঃ, এ সঙ্কীর্ণ পথে আসা ভাল হয় নাই! ওদিক হইতে একটি স্থূলাঙ্গী বিরলকেশা স্ত্রীলোক আসিতেছিল। মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া মধ্যপথেই এক পাশে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটির মুখে রাজ্যের বিরক্তি; মূলগায়েন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সন্তর্পণে সসঙ্কোচে স্থানটা পার হইতে হইতে গৌরদাসের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—এইখানেই একদিন লজ্জিতা রাধু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

আশ্চর্য্যের কথা আজও যে স্থূলাঙ্গী সেখানে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সে রাধু। গাছের শিকড়ে শিকড়ে ঘর জীর্ণ হওয়ায় তাহারা স্থানান্তরে

আখড়া বাঁধিয়াছে। সে এখন ঘরণী গৃহিণী, সন্তানের জননী। সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণযাত্রা দেখিয়া তাহার শরীরটা অবসন্ন হইয়া আছে এবং মনটাও তাহার ভাল নাই। দলের রাধাটিকে দেখিয়া বহুদিন পূর্ব্বের এমনই এক কিশোরকে তাহার মনে পড়িতেছিল। সেও রাধা। কতবার মনে হইয়াছে—এই যেন সেই! তাহাকে মনে করিয়া মনটা তাহার বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে। সে বিষণ্ণতা বিরক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিরক্তভাবেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গৌরদাস পরম সম্ভ্রমভরে রাধুকে অতিক্রম করিয়া গেল, রাধুও অপরিচয়ের সঙ্কোচ লইয়াই অবগুণ্ঠন টানিয়া তাহাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখে শূন্য পথ; পিছনে রাধুর স্মৃতি-বিজড়িত ওই আখড়ার ভগ্নস্তূপ। ওই গলিপথটা গভীর আকর্ষণে মূলগায়েনকে আকর্ষণ করিতেছিল, বুকে অসহ দুঃখ—রাধু নাই! বারবার তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। ছেলেটির গতির আকর্ষণে চলিবার অভিপ্রায়ে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মূলগায়েন রাধা ছেলেটিকে সম্মুখে আনিয়া বলিল—রাধে, তুমি আগে চল।

রাধারাণী! রাধু না থাক রাধারাণী আছে!

কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণযাত্রার দলটি গ্রামখানি ছাড়িয়া পথে বাহির হইল।

গাড়ীর উপরে মূলগায়েন ও কৃষ্ণ ছেলেটির পাশে সেই রাধা ছেলেটি। মন্থর গতিতে গাড়ীটা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ছেলের দল উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পল্লীর মেয়েরা ঘোমটার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল! বুড়াদের মনও আজ কাজে বসিতেছে না। রায়েদের মুলতুবী ঝগড়াটা আজ আবার সকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বৈষ্ণবদের মেয়ে রাধু ঘাট হইতে ফিরিয়া দাওয়ায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল; বাতের বেদনা যেন চাগাইয়া উঠিতেছে। তাহার উপর কানের পাশে যেন গানের সুর বাজিতেছে। চোখ বন্ধ করিলে ভাসিয়া উঠিতেছে যাত্রার ছবি; রাধা বলিতেছে,—না না সখি!

কিন্তু চোখ খুলিলে—কই? কোথায়?

ডাইনী

কে কবে নামকরণ করিয়াছিল সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নামটি আজও পূর্ণগৌরবে বর্ত্তমান; ছাতি-ফাটার মাঠ! জলহীন, ছায়াশূন্য দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মত মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া উঠে। এপার হইতে ও-পার পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে। তখন যেন ছাতি-ফাটার মাঠ নামগৌরবে মহামারীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মত ধূলার একটা ধূসর আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; অপর প্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের মসীরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি-ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর। শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য-নির্ব্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ! ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলার রাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এত বড় প্রান্তরটায় এখানে ওখানে কতকগুলি খৈরী ও সেয়াকূল জাতীয় কণ্টকগুল্ম। কোন বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে জন্মায় না; কোথাও জল নাই, গোটাকয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে কিন্তু মাঠখানির চারিদিকেই ছোট পল্লী—সবই নিরক্ষর চাষীদের গ্রাম; সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না, তাহারা বলে, কোন অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রসবিনী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চরমান পতঙ্গ-পক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরা-পাতার মত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রাসের মধ্যে।

সে-নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জ্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতি-ফাটার মাঠ! তাহারই ভাগ্যদোষে ঐ বিষজর্জ্জরতার উপরে আর এক ক্রূর দৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে। মাঠখানার পূর্ব্বপ্রান্তে 'দলদলির জলা' ; অর্থাৎ অত্যন্ত গভীর পঙ্কিল ঝরণা জাতীয় জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী—ভীষণ শক্তিশালিনী, নিষ্ঠুর ক্রূর এক বৃদ্ধা ডাইনী। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে—তবু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে, তাহার দৃষ্টি নাকি অচপল স্থির, আর সে দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিবদ্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর।

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘর ; ঘরখানার মুখ ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে ছাওয়া বারান্দা সেই বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিয়া থাকে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। তাহার কাজের মধ্যে সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। দুই তিনটা বাড়ীতে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাজ হইয়া যায়, লোকে ভয়ে ভয়ে ভিক্ষা বেশী পরিমাণেই দিয়া থাকে ; সেরখানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না, বাড়ী ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্দ্ধেক বিক্রী করিয়া দোকান হইতে একটু নুন, একটু সরিষার তেল, আর খানিকটা কেরোসিন তেল কিনিয়া আনে। বাড়ী ফিরিয়া আর এক বার বাহির হয় শুকনো গোবর ও দুই চারিটা শুকনো ডালপালার সন্ধানে। ইহার পর সমস্তটা দিন সে দাওয়ার উপর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। এমনি করিয়া চল্লিশ বৎসর সে একই ধারায় ঐ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধার বাড়ী এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ী সে কথাও কেহ সঠিক জানে না। তবে এ কথা নাকি নিঃসন্দেহ যে, তিন চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া

অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতি-ফাটার মাঠের নির্জ্জন রূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে! নির্জ্জনতাই উহারা ভালবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না।

মানুষ দেখিলেই যে অনিষ্টস্পৃহা জাগিয়া উঠে! ঐ সর্ব্বনাশী লোলুপ শক্তিটা সাপের মত লক্‌লকে জিভ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া উঠে! ডাইনী হইলেও সে তো মানুষ!

আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনিই শিহরিয়া উঠে! বহুকালের পুরাণো একখানি আয়না—সেই আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজের ভয় হয়—ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গল দুটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মত একটা ঝকমকে ধার! জরা-কুঞ্চিত মুখ, চুণের মত সাদা চুল, দন্তহীন মুখ। আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানার চারিদিকে কাঠের ঘেরটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কি সুন্দর লালচে রঙ, আর কি পালিশই না ছিল! আর আয়নার কাচখানা ছিল রোদ-চক্‌চকে পুকুরের জলের মত। কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কি পরিষ্কারই না দেখা যাইত! ছোট কপালখানিকে ঘেরিয়া একরাশ চুল—ঘন কালো নয়, একটু লালচে আভা ছিল চুলে; কপালের নীচেই টিকোল নাক—চোখ দুটি ছোটই ছিল, চোখের তারা দুটিও খয়রা রঙেরই ছিল—লোকেও সে চোখ দেখিয়া ভয় করিত, কিন্তু তাহার বড় ভাল লাগিত; ছোট চোখ দুটি আরও একটু ছোট করিয়া তাকাইলে মনে হইত আকাশের কোল পর্য্যন্ত এ চোখ দিয়া দেখা যায়! অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল নরুণ দিয়া চেরা, ছুরির মত চোখে, বিড়ালীর মত এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভাল লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না! কোথা দিয়া যে কি হইয়া যায়, কেমন করিয়া যে হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না; তবে হইয়া যায়।

প্রথম দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া যায় ঃ

বুড়োশিবতলার সম্মুখেই দুর্গাসায়রের বাঁধাঘাটের ভাঙা রাণার উপর সে দাঁড়াইয়াছিল—জলের তলে তাহার ছবি উল্টা দিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া জলের ঢেউয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া লম্বা হইয়া যাইতেছিল—জল স্থির হইলে লম্বা ছবিটি অবিকল তাহার মত দশ এগার বৎসরের মেয়েটি হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ বামুনবাড়ীর হারু চৌধুরী আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া সান-বাঁধান সিঁড়ির উপর তাহাকে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার সে রূঢ় কণ্ঠস্বর সে এখনও শুনিতে পায়—হারামজাদী ডাইনী তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এত বড় বাড়? খুন করে ফেল্‌ব হারামজাদীকে।

হারু সরকারের সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিতেছে।

সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল—ওগো বাবু গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো!

—আম দিয়ে মুড়ি খেতে দেখে যদি তোর লোভই হয়েছিল—তবে সে কথা বল্‌লি নে কেন হারামজাদী?

হ্যাঁ, লোভ তো তাহার হইয়াছিল, সত্যই হইয়াছিল, মুখের ভিতরটা তো জলে ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

—হারামজাদী, আমার ছেলে যে পেট বেদনায় ছট্‌ফট করছে।

সে আজও অবাক হইয়া যায়, কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল—কেমন করিয়া এমন হয়। কিন্তু এ-যে সত্য তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই! তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে—সে হারু সরকারের বাড়ী গিয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়াছিল, আর বার বার মনে মনে বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, ভাল ক'রে দাও, ওকে ভাল ক'রে দাও! কতবার সে মনে মনে বলিয়াছিল—দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি, এই লইলাম! আশ্চর্য্যের কথা—কিছুক্ষণ পরেই বার দুই বমি করিয়া ছেলেটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সরকার বলিয়াছিল—ওকে একটা আম আর—ছুটি মুড়ি দাও দেখি।

সরকার-গিন্নী একটা ঝাঁটা তুলিয়াছিল, বলিয়াছিল—ছাই দেব হারামজাদীর মুখে; মা-বাপ মরা অনাথা মেয়ে ব'লে দয়া করি—যেদিন হারামজাদী আসে সেই দিনই আমি ওকে খেতে দি। আর ও কিনা আমার ছেলেকে নজর দেয়! আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে দেখ! ওর ঐ চোখের দিষ্টি দেখে বরাবর আমার সন্দেহ ছিল—কখনও আমি ওর সাক্ষাতে ছেলেপুলেকে খেতে দিই নে। আজ আমি খোকাকে খেতে দিয়ে ঘাটে গিয়েছি—আর ও কখন এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কি দিষ্টি ওর!

লজ্জায় ভয়ে সে পলাইয়া গিয়াছিল। সেদিন সে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ীর দাওয়ায় শুইতে পারে নাই; শুইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে ঐ বুড়া-শিবতলায়। অঝোরঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিল আর বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টি ভাল ক'রে দাও, না হয় আমাকে কানা ক'রে দাও।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মাটির-মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ বৃদ্ধার অবয়বের মধ্যে এতক্ষণে ক্ষীণ একটি চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূর্ব্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই—দেবতার দোষই বা কি, আর সাধ্যই বা কি? বেশ মনে আছে—গৃহস্থের বাড়ীতে সে আর ঢুকিবে না, কিছুতেই ঢুকিবে না ঠিক করিয়াছিল। বাহির দুয়ার হইতেই সে ভিক্ষা চাহিত—গলা দিয়া কথা যেন বাহির হইতে চাহিত না—কোনও মতে বহুকষ্টে বলিত—দুটি ভিক্ষে পাই মা! হরিবোল!

—কে রে? তুই বুঝি? খবরদার ঘরে ঢুকবি নে। খবরদার।

—না মা! ঘরে ঢুকব না মা!

কিন্তু পর ক্ষণেই মনের মধ্যে কি যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠিত, এখনও উঠে! কি সুন্দর মাছভাজার গন্ধ, আহা-হা! বেশ খুব বড় পাকা-মাছের খানা বোধ হয়।

—এই-এই! হারামজাদী, বেহায়া উঁকি মারছে দেখ—সাপের মত!

—ছি ছি ছি! সত্যিই ত, সে উঁকি মারিতেছে—রান্নাশালের সমস্ত আয়োজন তাহার নরুণ-চেরা ক্ষুদ্র চোখের এক দৃষ্টিতে দেখা হইয়া গিয়াছে! মুখের ভিতর জিভের তলা হইতে ঝরণার মত জল উঠিতেছে।

বহুকালের গড়া জীর্ণ বিবর্ণ মাটির-মূর্ত্তি যেন কোথায় একটা নাড়া পাইয়া দুলিয়া উঠিল; ফাটধারা শিথিলগ্রন্থী অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খলাহীন অসমগতিতে চঞ্চল হইয়া পড়িল; অস্থির ভাবে বৃদ্ধা এবার নড়িয়াচড়িয়া বসিল—বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয়,—কেমন করিয়া এমন হয়, সে কথা সারা জীবন ধরিয়াও যে বুঝিতে পারা গেল না। অস্থির চিন্তায় দিশাহারা চিত্তের নিকট সমস্ত পৃথিবীই যেন হারাইয়া যায়!

কিন্তু সে তার কি করিবে? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে? সে তার কি করিবে, কি করিতে পারে? প্রহৃত পশু যেমন মরীয়া হইয়া অকস্মাৎ আঁ-আঁ গর্জ্জন করিয়া উঠে—ঠিক তেমনি একটা ই-ই শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শণের মত চুলগুলাকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া সোজা হইয়া বসিল। ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি চাপিয়া, ছাতিফাটার মাঠের দিকে নরুণ-চেরা চোখের চিলের মত দৃষ্টি হানিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

ছাতি-ফাটার মাঠটা যেন ধোঁয়ায় ভরিয়া ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্র মাস, বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলির মত কি একটা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে! একটা ফুৎকার যদি সে দেয় তবে মাঠের ধূলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে।

ঐ ধোঁয়ার মধ্যে জমাট সাদার মত ওটা কি? নড়িতেছে যেন; মানুষ? হ্যাঁ মানুষই তো! মনের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে। ফুঁ দিয়া ধূলা উড়াইয়া, দিবে মানুষটাকে উড়াইয়া? হি হি হি করিয়া পাগলের মত হাসিয়া একটা অবোধ্য নিষ্ঠুর কৌতুক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

দুই হাতের মুঠি প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া সে আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল—না না না! ছাতি-ফাটার মাঠে মানুষটা ধূলার গরমে শ্বাসরোধী ঘনত্বে মরিয়া যাইবে।

নাঃ—ওদিকে আর সে চাহিবেই না। তার চেয়ে বরং উঠানটায় আর একবার ঝাঁটা বুলাইয়া, ছড়াইয়া-পড়া পাতা ও কাঠকুটাগুলাকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? বসিয়া বসিয়াই সে ভাঙ্গিয়া-পড়া দেহ-খানাকে টানিয়া উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে শুরু করিল।

জড়ো করা পাতাগুলো ফর ফর করিয়া অকস্মাৎ সর্পিল ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঝাঁটার মুখে টানিয়া আনা ধূলার রাশি তাহার সহিত মিশিয়া বুড়ীকেই যেন জড়াইয়া ধরিতেছিল, মুখে-চোখে ধূলা মাখাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দ্রুত আবর্ত্তিত পাতাগুলা তাহাকে যেন সর্ব্বাঙ্গে প্রহার করিতেছে। জরাগ্রস্ত রোমহীন আহতা মার্জ্জারীর মত ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটা-গাছটা আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—বেরো বেরো বেরো!

বার বার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের ঐ আবর্ত্তটাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। আবর্ত্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধূলা হু-হু করিয়া উড়িয়া ধূলার একটা ঘুরন্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে! শুধু কি একটা? এখানে ওখানে ছোট বড় কত ঘুরণপাক উঠিয়া পড়িয়াছে—মাঠটা যেন হাজারটা হইয়া উঠিতেছে! একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মত অধীর হইয়া উঠিল; সহসা সে ন্যুব্জ দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটা প্রসারিত করিয়া সাধ্যমত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। পৃথিবীর এক মাথা উঁচু হইয়া তাহাকে যেন গড়াইয়া কোন অতলের দিকে ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তিও তাহার ছিল না। ছোট শিশুর

মত হামাগুড়ি দিয়া সে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। দারুণ তৃষ্ণায় গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে!

—কে রইছ গো ঘরে? ওগো!

জলে-পচা নরম মরা-ডালের মতই বৃদ্ধা বাঁকিয়া-চুরিয়া দাওয়ার একধারে পড়িয়া ছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোনমতে মাথা তুলিয়া সে বলিল—কে?

ধূলিধূসর দেহ, শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ একটি যুবতী মেয়ে বুকের ভিতর কোন একটা বস্তু কাপড়ের আবরণে ঢাকিয়া বহুকষ্টে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মেয়েটি বোধহয় ছাতি-ফাটার মাঠ পার হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া মেয়েটি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এক পা এক পা করিয়া পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল—একটুকুন জল।

মাটির উপর হাতের ভর দিয়া বৃদ্ধা এবার অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল। মেয়েটির শুষ্ক, পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আহা-হা বাছারে! আয়, আয়! বোস!

সভয়ে সন্তর্পণে দাওয়ার এক পাশে বসিয়া মেয়েটি বলিল—একটুকুন জল দাও গো! মমতায় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড় একটা ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া একটুকরা পাটালির সন্ধানে হাঁড়িতে হাত পুরিয়া বলিল—আহা মা, এই রোদে ঐ রাক্কুসী মাঠে কি ব'লে বের হলি তুই?

বাহিরে বসিয়া মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল, কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল —আমার মায়ের বড় অসুখ মা। বেরিয়েছিলাম রাত থাকতে! মাঠের মাথায় এসে আমার পথ ভুল হয়ে গেল, মাঠের ধারে ধারে আমার পথ, কিন্তুক এসে পড়লাম একেবারে মধ্যিখানে!

জলের ঘটি ও পাটালির টুকরাটি নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিল— মেয়েটির পাশে একটি শিশু! গরম জলে সিদ্ধ শাকের মত শিশুটি ঘর্ম্মাক্ত দেহে

হ্যাতাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল—দে দে বাছা, ছেলেটার চোখে মুখে জল দে! মেয়েটি ছেলের মুখে চোখে জল দিয়া আঁচল ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া দিল।

বৃদ্ধা দূরে বসিয়া ছেলেটির দিকে চাহিয়া রহিল; স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের প্রথম সন্তান বোধ হয়, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউডগার মত নরম, সরস—দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে!

এঃ, ছেলেটা কি ভীষণ ঘামিতেছে! দেহের সমস্ত জল কি বাহির হইয়া আসিতেছে! চোখদুটা লাল হইয়া উঠিয়াছে! তবে কি···? কিন্তু সে তাহার কি করিবে? কেন তাহার সম্মুখে আসিল? কেন আসিল? ঐ কোমল নধরদেহ শিশু ময়দার মত ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কাল বুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া···; জীর্ণ জর-জর ত্বকের উপর একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! এঃ, ঘামে ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসাস্বাদ! নিতান্ত অসহায়ের মত আর্ত্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল—খেয়ে ফেললাম! ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে! পালা, পালা—তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি!

শিশুটির মা ঐ যুবতী মেয়েটি দুই হাতে ঘটি তুলিয়া ঢক ঢক করিয়া জল খাইতেছিল—তাহার হাত হইতে ঘটিটা খসিয়া পড়িয়া গেল; সে আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বৃদ্ধার বিস্ফারিত-দৃষ্টি ক্ষুদ্র চোখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—এটা তবে রামনগর? তুমি সেই—? সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছেলেটিকে ছোঁ মারিয়া কুড়াইয়া লইয়া যেন পক্ষিণীর মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু সে কি করিবে? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি! কাল

সে গ্রামের পথে বাহির হইবে কোন্ মুখে ? লোকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না সে তাহা জানে; কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যে-কথা ফুটিয়া উঠিবে তাহা সে চোখে দেখিবে কি করিয়া! ছেলেমেয়েরা এমনিই তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যায়, কেহ কেহ কাঁদিয়াও উঠে; আজিকার ঘটনার পর তাহারা বোধ হয় আতঙ্কে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া যাইবে। ছি ছি ছি!

এই লজ্জায় একদা সে গভীর রাত্রে আপনার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে ত অনেকটা ডাগর হইয়াছে! তাহারই বয়সী তাহাদেরই স্বজাতীয়া সাবিত্রীর পূর্ব্বদিন রাত্রে খোকা হইয়াছে। সকালেই সে দেখিতে গিয়াছিল। সাবিত্রী তখন ছেলেটিকে লইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া বসিয়া গায়ে রোদ লইতেছিল। ছেলেটি শুইয়া ছিল কাঁথার উপর। কালো চকচকে কি সুন্দর ছেলেটি!

ঠিক এমনি ভাবেই—ঠিক এই আজিকার মতই সেদিনও তাহার মনে হইয়াছিল ছেলেটিকে লইয়া আপনার বুকে চাপিয়া, নরম ময়দার তালের মত ঠাসিয়া ঠোঁঠে ঠোঁট দিয়া চুমায় চুমায় চুষিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। তখন সে বুঝিতে পারিত না, মনে হইত—এ বুঝি কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ।

সাবিত্রীর শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিল—বলি ওলো আক্কেলখাগী হারামজাদী, খুব যে ভাবীসাবীর সঙ্গে মস্করা জুড়েছিস! আমার বাছার যদি কিছু হয় তবে তোকে বুঝব আমি, হ্যাঁ!

তারপর বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তাহাকে বলিয়াছিল—বেরো বলছি, বেরো! হারামজাদীর চোখ দেখ দেখি!

সাবিত্রী ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বুকে ঢাকিয়া দুর্ব্বল শরীরে থর থর করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছিল। মর্ম্মান্তিক দুঃখে আহত হইয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল। বার-বার সে মনে মনে বলিয়াছিল—ছি ছি! তাই নাকি সে পারে? হইলই বা সে ডাইনী, কিন্তু তাই বলিয়া, কি সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে? ছি ছি! ভগবানকে ডাকিয়া

সে বলিয়াছিল—তুমি ইহার বিচার করিবে। একশ বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে! দিয়া প্রমাণ করিয়া দিও সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালবাসি।

কিন্তু অপরাহ্ণ বেলা হইতে-না-হইতেই তাহার অত্যুগ্র বিষময়ী দৃষ্টি-ক্ষুধার কলঙ্ক অতি নিষ্ঠুরভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমন ভাবে কাতরাইতেছে যে, ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে।

লজ্জায় সে পলাইয়া গিয়া গ্রামের প্রান্তে শ্মশানে জঙ্গলের মধ্যে সন্তর্পণে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া ছিল। বার-বার মুখের থুথু মাটিতে ফেলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল—কোথায় রক্ত! গলায় আঙুল দিয়া বমি করিয়াও দেখিতে চহিয়াছিল, বুঝিতে চাহিয়াছিল। প্রথম বার-দুয়েক বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার পরই কুটি কুটি রক্তের ছিটা—শেষকালে একেবারে খানিকটা তাজা রক্ত উঠিয়া আসিয়াছিল। সেইদিন সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা।

গভীর রাত্রে—সেদিন বোধ হয় চতুর্দ্দশী ছিল, হ্যাঁ চতুর্দ্দশীই তো—বাকুলের তারাদেবী-তলার পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা তারাদেবী; পূর্ণিমার আগের প্রতি চতুর্দ্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানৎ করিয়াছে—মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। কিন্তু মা মুখ-তুলিয়া চাহেন নাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মন যেন দুঃখের হতাশায় উদাস হইয়া গেল। মনের সকল কথা ছিন্নসূত্র ঘুড়ির মত শিথিলভাবে দোল খাইতে খাইতে ভাসিয়া কোন্ নিরুদ্দেশ লোকে হারাইয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের পিঙ্গল তারায় অর্থহীন দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল—সে সেই দৃষ্টি মেলিয়া ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছাতি-ফাটার মাঠ ধূলায়

ধূসর, বাতাস স্তব্ধ ; ধূসর ধূলার গাঢ় নিস্তরঙ্গ আস্তরণের মধ্যে সমস্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া হারাইয়া গিয়াছে।

ঐ অপরিচিতা পথচারিণী মেয়েটির ছেলেটি এ-গ্রাম হইতে খান দুই গ্রাম পার হইয়া পথেই মরিয়া গিয়াছে। যে-ঘাম সে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিল সে-ঘাম আর থামে নাই। দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া কে যেন বাহির করিয়া দিল। কে আবার? ঐ সর্ব্বনাশী! মেয়েটি বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়াছে—কেন গেলাম গো—আমি ঐ ডাইনীর কাছে কেন গেলাম গো! আমি কি করলাম গো!

লোক শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু-কামনা করিল। একবার জন কয়েক জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঐ ঝরণার কাছে আসিয়াও জুটিল। বৃদ্ধা ডাইনী ক্রোধে সাপিনীর মত ফুলিয়া উঠিল—সে তাহার কি করিবে। সে আসিল কেন? তাহার চোখের সম্মুখে এমন সরস লাবণ্যকোমল দেহ ধরিল কেন? অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে এক সময় চিলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে। সেই চীৎকার শুনিয়া তাহারা পলাইয়া গেল। কিন্তু সে এখনও ক্রুদ্ধা অজগরীর মত ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদ্গার করিতেছে, আবার নিজেই গিলিতেছে! কখনও তাহার হি হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনও বা ক্রুদ্ধ চীৎকারে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিতে ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছা হইতেছে বুক চাপড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া পৃথিবী ফাটাইয়া হা-হা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই! এঃ সে আজ একটা গোটা শিশুদেহের রস অদৃশ্য-শোষণে পান করিয়াছে!

ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। শুক্লা নবমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় ছাতি-ফাটার মাঠ একখানা সাদা ফরাসের মত পড়িয়া আছে। কোথায় একটা পাখী অশ্রান্ত ভাবে ডাকিয়া চলিয়াছে—চোখ গে-ল! চোখ গে-ল! আমগাছগুলির মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। ঘরের পিছনে ঝরণার

ধারে দুইটা লোক যেন মৃদুগুঞ্জনে কথা কহিতেছে! আবার সেই ছেলেগুলা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে নাকি? অতি সন্তর্পিত মৃদু পদক্ষেপে বৃদ্ধা ঘরের কোণে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। না, তাহারা নয়। এ বাউড়ীদের সেই স্বামীপরিত্যক্তা উচ্ছলা মেয়েটা—আর তাহারই প্রণয়মুগ্ধ বাউড়ী ছেলেটা!

মেয়েটা বলিতেছে—না, কে আবার আসবে এখুনি, আমি ঘর যাব।

ছেলেটা বলিল—হেঁ! এখানে আসছে নোকে; দিনেই কেউ আসে না, তা রাতে।

—তা হোক! তোর বাবা যখন আমার সাথে তোর সাঙা দেবে না, তখন তোর সাথে এখানে কেনে থাকব আমি?

ছি ছি ছি! কি লজ্জা গো! কোথায় যাইবে সে! যদি তাই গোপনে দুইজনে দেখা করিতে আসিয়াছে—তবে মরিতে ওখানে কেন? তাহারা এই বাড়ীতে আসিল না কেন? তাহার মত বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা কি? কি বলিতেছে ছেলেটা?—বাবা-মা বিয়ে না দেয়, চল্ তোতে আমাতে ভিনগাঁয়ে গিয়ে বিয়ে ক'রে সংসার পাতব! তোকে নইলে আমি বাঁচব না।

আ মরণ ছেলেটির পছন্দের! ঐ কুপোর মত মেয়েটাকে উহার এত ভাল লাগিল! তাহার মনে পড়িয়া গেল তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরের বোলপুর শহরের পানওয়ালার দোকানের সেই বড় আয়নাটা। আয়নাটার মধ্যে লম্বা ছিপছিপে চৌদ্দ-বছরের একটি মেয়ের ছবি! একমাথা রুক্ষ চুল, ছোট কপাল, টিকোলো নাক, পাতলা ঠোঁট। চোখ দুটি ছোট—তারা দুটি খয়রা রঙের—কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বই কি! আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজের ছবিই দেখিতেছিল। তখন আয়না ত তাহার ছিল না, আয়নাতে আপনার ছবি সে তখনও কোনদিন দেখে নাই।—আরে, তুই আবার কে রে? কোথা থেকে এলি? লম্বা-চওড়া এক জোয়ান পুরুষ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আগের দিন সন্ধ্যায়

গণপতি মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, ঠোঁটে তাহার কৌতুকভরা মৃদু হাসি। সরস্বতী বলিল—কি ? কথা বলছ না যে ? 'বুড়া হাতির মাথায় দিলাম ডাঙ্গসেরই বাড়ি' না কি গো ? বলিয়া সে আবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

গণপতি বলিল—তার চেয়ে চিটে-কদমা দিলি না কেনে 'দুষ্টু সরস্বতী' ? লোকের দাঁতে দাঁতে লেগে গিয়া আর খুলত না !

—উহুঁ ! সরস্বতীর কথাটা পছন্দ হইল না।

কিছুক্ষণ পর গণপতি সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিল—দেখ !

সে নূতন পটের নূতনতম অধ্যায়ের ছবিটি তাহাকে দেখাইল। যমুনার ঘাটে একটি মেয়ের মুখের কাছে আর একটি মেয়ে তর্জ্জনী তুলিয়া চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কৃষ্ণলীলার পটের মধ্যে এ ছবি কোনো কালে সরস্বতী দেখে নাই, সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—ই আবার কি হ'ল গো গুণিন ?

গণপতি বাঁ-হাতে পটখানি তুলিয়া ধরিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে ছবি দেখাইয়া গাহিল—

কুটীলার চসকু দুটি তারা হেন জলে,
দন্ত কিড়িমিড়ি করি রাধিকাকে বুলে।
"কালামুখী কলঙ্কিনী রাই লো !
তোর মতন কুল-মজানী গোকুলে আর নাই লো !"

সরস্বতী মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে হাসিল, তারপর উঠিয়া বসিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছবিখানি দেখিতে আরম্ভ করিল। বলিল কুটিলের নাকটা কিন্তুক আর টুকচা তুলে দিতে হ'ত বাপু! এমনি—ক'রে !

বলিয়া সে নিজেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া দেখাইয়া দিল! গণপতি হাসিল। সরস্বতী আবার মন দিয়া ছবিখানি দেখিতে আরম্ভ করিল।

আবার সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কোন্ দোকানের রঙ আনছ বুল দেখি? সব রঙ কেমন মেটে খস্‌খসে লাগছে!

গণপতি বলিল—ধূলা পড়েছে রে, রঙের দোষ নাই। পথের ধারে ঘর—ফাগুন মাসের কাঁচা সড়ক—গাড়ীতে গাড়ীতে পথের ধূলা উড়ছে!

এ কথাতেও সরস্বতীর হাসি।

—তোমার মাথাটা কি হয়েছে গো! হি-হি-হি-হি! পাকা চুলের ডগায় ডগায় মেটে মেটে ধূলা—ঠিক কদম ফুল!

ওই মেয়েটির রাগের কারণ আছে। উহার স্বামী ঘনশ্যাম পটুয়াই গণপতির নাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সরস্বতীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন! ঘনশ্যাম রাজমিস্ত্রীর কাজ করে, দু পয়সা উপার্জ্জনও করে। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গোটাকয়েক নূতন কাজ পটুয়াদের পুরুষেরা গ্রহণ করিয়াছে। আগে তাহারা পট আঁকিত—পট দেখাইয়া গান করিত, বিনা-পটেও মন্দিরা বাজাইয়া পুরাণের পালা গান করিত, প্রতিমা গড়িত, পুতুল গড়িত, রাজমিস্ত্রীর কাজ করিত, যাহারা সূক্ষ্ম কাজ পারিত না—তাহারা মাটির ঘর তৈয়ার করিত। এখন তাহারা দেওয়ালে তেল-রঙ দিয়া লতাপাতা ফুল আঁকে—কাঠের উপর রঙ ও বার্নিশের কাজও করে। কেহ কেহ তাঁতের কাজও করে। ঘনশ্যাম রঙ-মিস্ত্রীর কাজ শিখিয়াছে, এখান ওখান করিয়া বড়লোকের বাড়ীতে রঙের কাজ করে। শহর-বাজার হইতে সরস্বতীর পাতি জরদাটি সে নিয়মিত জোগাইয়া থাকে; রূপালী জরদা, কিমাম, কখনও বা আর দুই-চারিটা শখের জিনিসও আনিয়া দেয়।

ঘনশ্যাম তাহাকে বলে—রাঙাদিদি।

সরস্বতী মিশি-দেওয়া দাঁতের ঝিলিক হানিয়া হাসিয়া তাহাকে ডাকে—কেলোসোনা।

ঘনশ্যামের রঙ কালো। নামকরণ করিয়া দিয়াছে গণপতি নিজে।

সেদিন সরস্বতীর বিলানো ধানী লঙ্কার ঝাল গোটা পাড়ায় একটা জ্বালা

ধরাইয়া দিয়াছিল। নাতিদের দল মুখ ভার করিয়াই আসিয়া বসিল। ঘনশ্যামের সমাদরটা সকলের মনেই এতদিন গোটা ধানী লঙ্কার মত সরস রহস্যের আবরণে জ্বালা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লুকানো ছিল। আজ সরস্বতীই সেগুলি ভাঙ্গিয়া ভিতরের বিষ বাহির করিয়া দিয়াছে। ঘনশ্যামও আসিয়াছে। তাহার মনটাও ভাল নাই, তাহার স্ত্রী আজ তাহার সহিত চরম বচসা করিয়া ছাড়িয়াছে।

গণপতি নূতন পট দেখাইতেছিল। সরস্বতী রান্না করিতে করিতে অভ্যাসমত সরস রহস্যবাণগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের দল আজ তেমন সাড়া দিতেছে না। সরস্বতীর জলের অভাব ঘটিয়াছিল, সে ঘড়াটা কাঁখে লইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আলোটা কেউ দেখাবে হে নাগরেরা?

একজন বলিল—তোমার কেলেসোনা যাক।

—তাই এস হে, তুমিই এস ভাই।

ঘনশ্যাম উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল—যাবে তো কেলেসোনা, মজুরি কি দিবা গো রাঙাদিদি?

দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া সরস্বতী ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—মজুরি কিসের হে? বেগার দিয়া কে কোন্ কালে মজুরি পায়?

—উঁ---হুঁ! ঘনশ্যাম বেগার লয়।

—বেগার লয়?

—না। উ হ'ল গিয়া কেলোসোনা; কাল রঙের সোনা, সোনার পাথরবাটি, উ কেনে বেগার হবে?

সরস্বতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল,—তা বটে! বুল হে কেলোসোনা কি লিবা মজুরি?

ঘনশ্যাম কিছু বলিবার পূর্ব্বেই একজন বলিয়া উঠিল—

"সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা,
শ্রীমতীকে পার করিতে লিব কানের সোনা !"

অপর একজন সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—তোমাকে রাঙাদিদি আর বুলব না ঠাকরুণদিদি—বুলব 'বিনোদিনী'। 'কেলোসোনা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী'। তোমার নাম হ'ল 'বিনোদিনী'।

গণপতি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—তুমি বড় ভাল বুলেছ হে লাতি ; এ মজলিসে কল্কে তোমারই আগে পাওনা ! লাও—কল্কে লাও।

হুঁকা-সমেত কল্কেটি সে তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

সরস্বতীও খিল খিল করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, সে উচ্ছল হিল্লোলে ঘাটের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তবে বাঁশী লাও হে কেলোসোনা, ঘাটের ধারে তুমি বাজাইবা—আমি জল ফেলব আর জল ভরব।

সরস্বতীর এই নির্লজ্জতায় সমস্ত নাতি-সম্প্রদায়ও আজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘনশ্যামের সহিত গোপন প্রেমের কথাটা এমন ঘোষণা করিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ায় তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ রি রি করিয়া উঠিল। একজন গণপতিকে বলিল—তোমাকে আমরা খাতির করি ভালবাসি ; কিন্তু তুমি এইবার গলায় দড়ি দিয়া মর ! ছি !

গণপতি উত্তরে নাতি-সম্প্রদায়কে গণনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, সকলে বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ! গণনা শেষ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ভাবেই বুড়া বলিল—হ'ল না ভাই। তোমরা পাঁচের অনেক বেশী, আট জনা। পাঁচ হ'লি না হয় বউয়ের নাম দিতাম দ্রৌপদী—তোমরা হতে পাণ্ডব।

কথা শেষ করিয়া বুড়া মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

নাতির দল কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া নীরবেই একে একে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সরস্বতী ঘাট হইতে ফিরিল উচ্চ কণ্ঠে হাসিতে হাসিতে। ঘনশ্যাম নীরবে আলোটি নামাইয়া দিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। গণপতি বলিল—বস হে কেলেসোনা!

ঘনশ্যাম ঢোক গিলিয়া বলিল—রাত অনেক—না—বসব না। বলিতে বলিতে সে চলিতে আরম্ভ করিল। সরস্বতীর হাসি আরও বাড়িয়া গেল।

গণপতি কোন প্রশ্ন করিল না, সে তামাক সাজিতে বসিল। সরস্বতী এবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বুলে, তালাক দাও বুড়াকে, নিকা কর আমাকে!

গণপতি চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া সরস্বতীর মুখের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই সেও মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

পরদিন হইতে নাতি-সম্প্রদায় গণপতির বাড়ীতে নামাজ পড়িতে আসা বন্ধ করিল; অপর এক প্রৌঢ় পটুয়ার বাড়ীতে তাহারা নামাজের আস্তানা গাড়িল। অভিরাম পটুয়ার পয়সা গণপতি অপেক্ষা কম নয়, সে ভাল রাজমিস্ত্রী, সৌখীন নক্সার কাজ সে ভালই করে। কিন্তু কুলকর্ম্মে রাজের কাজটা পটুয়া সম্প্রদায়ের নিকট্ কৌলীন্যজনক নয়। অভিরাম নামাজ-প্রার্থীদের পুরোভাগে দাঁড়াইবার অধিকার এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া খুশী হইয়া উঠিল। সে শুধু জল তামাকের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, প্রত্যহ এক বাণ্ডিল বিড়ির ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিল! ডুগি তবলা—মন্দিরা কিনিয়া পালা-গানের মহড়ার আড্ডাও খুলিয়া দিল অভিরাম।

কেবল ঘনশ্যাম আসা ছাড়িল না। এই লইয়া পটুয়াদের রমণী-সমাজ একেবাঁরে শতমুখী হইয়া উঠিল। তাহারা সরস্বতীর সহিত এক সঙ্গে ব্যবসায়ে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিল। কিন্তু সরস্বতীর তাহাতে কিছু আসিয়া গেল না। চুড়ি-পুতুলের পসরা চাপাইয়া সে একাই গ্রামগ্রামান্তর ঘুরিয়া আসিত। প্রতিবেশিনীদের মুখে মুখে তাহার কলঙ্ককাহিনী অঞ্চলময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ফলে হাটে তাহার পসরার সম্মুখে ভিড় জমিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল

মধুমক্ষিকার ঝাঁকের মত। নির্জ্জন পথে-প্রান্তরেও দুই একজন ক্রেতার পর্যন্ত অভাব হইত না—সরস্বতী সেইখানেই চুড়ি পুতুলের পসরা নামাইয়া বসিত। তাহার রাঙাদিদি নামাটা পর্যন্ত সকলের জানা হইয়া গিয়াছে; ক্রেতারা হাসিয়া ডাকে—রাঙাদিদি !

সে বলে—কি লিবা লাও লাতি !

ঘনশ্যাম ইহাতে একদিন রাগ করিল—না রাঙাদিদি, ছি !

সরস্বতী কথায় জবাব দিল না, হাসিয়া সোরগোল তুলিয়া ফেলিল।

ঘনশ্যাম আবার বলিল—হেসো না, ইটা হাসির কথা লয় !

পরমুহূর্ত্তেই মুখে কাপড় দিয়া উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে সে ভাঙিয়া পড়িল।

ঘনশ্যাম রাগ করিয়া চলিয়া গেল। দুই দিন সে আসিল না পর্যন্ত। তৃতীয় দিনে সরস্বতী পসরা মাথায় করিয়া দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী গোপালপুরের পথ ধরিল। ওই গ্রামেই ঘনশ্যাম এখন জমিদারের পুরানো বাড়ীখানা নূতন করিয়া রঙ করিতেছে। বাবুরা নাকি শহর হইতে এখানে আসিয়া বাস করিবেন। গ্রামে কাহারও বাড়ী সরস্বতী যায় না, গেলে মেয়েরা তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া তোলে।

প্রকাণ্ড বড় বড় থামওয়ালা জমিদারের সদর কাছারী, ফটকের দুই পাশে জমানো চুণ-বালিতে গড়া দুইটা সিংহ। সরস্বতী ফটকের দুয়ারে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া হাঁকিল—চা—ই, রে—শমী—চুড়ি—

হাঁক সে আর শেষ করিতে পারিল না' খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইয়া গেল! কিন্তু সে হাসিতে তাহার অকস্মাৎ ছেদ পড়িয়া গেল। জমিদারের কাছারী-বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া কুড়ি বাইশ বছরের সোনার বরণ যেন কোন্ রাজার ছেলে।

ঘনশ্যামও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সে অন্তরালে দাঁড়াইয়া বার বার হাত ইসারা করিতেছিল—পালাও, পালাও !

সরস্বতীর তখন ঘনশ্যামের ইসারা দেখিবার ও বুঝিবার অবসর ছিল না, বিস্ময়-বিস্ফারিত মুগ্ধ নেত্রে সে ওই রাজার ছেলের দিকেই চাহিয়া ছিল!

ছেলেটি রাজারই ছেলে, জমিদারের বড় ছেলে; সম্প্রতি পড়া-শুনার শেষ পরীক্ষা দিয়া গতকাল এখানে আসিয়াছে, এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিবে। ছেলেটি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কি চাই?

—চুড়ি, রেশমী চুড়ি আছে, লিবেন?

ছেলেটি সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি নিয়ে কি করব?

সরস্বতী অপ্রতিভ হইয়া গেল—কিন্তু পরমূহূর্ত্তেই সে উত্তর খুঁজিয়া পাইল, বলিল—বউরাণীর হাতে পরায়ে দিব।

—বউরাণী নেই। চুড়ির দরকার নেই।

—পুতুল, পুতুল লিবেন?

—তাই বা নিয়ে কি করব?

—টেবিলে সাজায়ে রাখবেন। সায়েবেরা লিয়া যায় আমাদের পুতুল।

—তাই নাকি? দেখি তোমার পুতুল!

সরস্বতীর পসরা নামাইয়া বসিল, সম্ভ্রমভরেই বোধ করি, কিন্তু জীবনে বোধ হয় এই প্রথম মাথায় সে ঘোমটা টানিয়া দিল। তারপর বাহির করিল মাটির পুতুল—কেশবতী, কঙ্কাবতী, মালিনী, গোয়ালিনী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ।

রাজার ছেলে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—বাঃ! এ পুতুল তোমরা নিজেরা গড়?

—আজ্ঞা হ্যাঁ গো!

ঘোড়াটি তুলিয়া লইয়া দেখিয়া শুনিয়া তরুণ জমিদার বলিল—এটা ঘোড়া নাকি?

—আজ্ঞা হ্যাঁ। পক্ষীরাজ ঘোড়া আকাশে উড়ে কিনা! ই ঘোড়া তো লয়।

—ঠিক কথা। কত দাম নেবে বল তো?

সরস্বতী মুচকী হাসিয়া মাথার ঘোমটাটা আরও টানিয়া দিয়া বলিল—ওরে বাপরে! দাম আমি বুলতে পারি,—না লিতে পারি! আপনি দিবেন বক্‌শিস। আপনারা হাত ঝাড়লে তাই আমাদের পর্ব্বত।

জমিদারের ছেলেটি একটি টাকা সরস্বতীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সরস্বতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পুতুলের দাম দু'পয়সা হিসাবে সাতটা পুতুলের জন্য চৌদ্দ পয়সার বেশী কেউ দিত না; সে টাকাটা কুড়াইয়া কপালে ঠেকাইয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। টাকা বাঁধিয়াও সে উঠিল না, আবার আরম্ভ করিল —পট লিবেন না? পট?

—পট?

—আজ্ঞা হাঁ; রামলীলা, কেষ্টলীলা, গৌরলীলা! সায়েবেরা কিনে লিয়ে যায় আজ্ঞা!

—ও! পট! তোমরা পট আঁক নাকি? কিন্তু নতুন পট তো চলবে না, পুরনো পট চাই, আছে তোমাদের?

—আজ্ঞা, আমার মরদ খুব পুরানো নোক, ষাট বছরের বুড়ো; তারই আঁকা পট আছে।

—তোমার মরদ—মানে তোমার স্বামী? ষাট বছরের বুড়ো?

—আজ্ঞা হাঁ গো। সরস্বতী মুখ হেঁট করিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুক খুক করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

ঘনশ্যাম আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রথম হইতেই সমস্ত শুনিতেছিল, সরস্বতীর চাপা হাসির শব্দে তাহার সর্ব্ব-অন্তর ঘৃণায় রি-রি করিয়া উঠিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল চা—-ই, রে—শমী চুড়ি—

জমিদার-বাড়ীর কাছারী ঘরের জানালায় রাজার ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। পট এনেছ?

মাথার পসরা কাঁখে নামাইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া সরস্বতী হাসিয়া বলিল—রাজার হুকুম, না এনে পারি ? বাপ রে।

—তবে ? রেশমী চুড়ি বলে হাঁকলে যে ?

—চাই—পট—বলতে কেমন লাগে যে। বলিয়া সে খালি হাতটায় কাপড় টানিয়া মুখে চাপা দিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

—কই, আন তোমার পট, এই ঘরেই নিয়ে এস।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পসরা নামাইয়া সরস্বতী বলিল—খুব ভাল পট এনেছি, গৌরলীলার পট।

—গৌরলীলার পট বুঝি খুব ভাল ?

—গৌরলীলার পট আপনার লাগবে ভাল। গৌরচাঁদের মত বরণ আপনার তেমুনি রূপ—

—বল কি।

—হ্যাঁ। আপনকার নাম দিয়েছি আমি গৌরচাঁদ। এই দেখেন বলিয়া পট খুলিয়া সে সুরে আরম্ভ করিল—

সোনার গৌর যায় পথ আলো করি
যুবতীরা লাজে যায় মরমেতে মরি—
হায় রে এরে কেউ বাঁধতে লারে।

ত্রিশ টাকায় তিনখানা পট বিক্রী করিয়া সরস্বতী রঙ্গভরে বিপুল উচ্ছ্বাসে হেলিয়া দুলিয়া ঘরে ফিরিল। নোট তিনখানা গণপতির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—লাও ; আমার গৌরচাঁদের কেমন দরাজ হাত দেখ। পরমুহূর্ত্তেই মুখে কাপড় দিয়া হাসি আরম্ভ হইয়া গেল। হাসিতে হাসিতে বলিল—বুলেছি বাবুকে। রাগ করে নাই। বুললাম, আপনার নাম দিয়েছি আমি গৌরচাঁদ। তা'মুখখানা হয়্যা উঠল সিন্দূরে মেঘের পারা।

গণপতিও হাসিল—আজ কিন্তু তাহার হাসি ম্লান। সে বলিল—কিন্তুক

গৌর-প্রেম ইয়ারা যে সইবে না বুলছে। মেয়েগুলান তো শাঁখের মত গলা বার করেছে। কেলোসোনা তোমার ধুয়া তুলেছে—মলে ফেলব না।

সরস্বতী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিল—বাবারে তবে তো ভয়ে আমি মরে গেলাম। ভেবো নাই তুমি, তুমার আগে আমি মরব। তুমি আবার একটা নিকা করবে—টুক্‌টুকে—চম্পাবতীর পারা বরণ।

গণপতি হাসিয়া বলিল—না রে রাঙাবউ ; দেহ আমার ভাল নাই।

সরস্বতী হাসিল—বিষণ্ণ হাসি, বলিল—সেও তুমি ভেবো নাই।

গণপতি আর কিছু বলিল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার গোপালপুরের পথে হাঁক উঠিল—চাই রেশমী চুড়ি!

গণপতি মিথ্যা কথা বলে নাই। কিন্তু সরস্বতীর চোখে তাহা পড়ে নাই। গণপতির শরীর ভিতরে ভিতরে শূন্যগর্ভ হইয়া উঠিয়াছিল। দিনদশেক পরেই একদিন সরস্বতী ওই গোপালপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তুলি হাতে করিয়াই অর্দ্ধসমাপ্ত পটের সম্মুখে গণপতি নিস্পন্দ নিথর হইয়া পড়িয়া আছে। একটা দুর্দ্দমনীয় কম্পনে থর থর করিয়া সে বসিয়া পড়িল।

গণপতি মরিল, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিতে যে আশঙ্কা করিয়াছিল সে আশঙ্কা মিথ্যা হইয়া গেল! তাহার নাতির দল ছুটিয়া না আসিয়া পারিল না। কিন্তু একটি মেয়েও আসিল না সরস্বতীকে সান্ত্বনা দিতে।

গণপতির সৎকার শেষে নাতিরা আসিয়া বহুদিন পরে আবার রাঙাদিদির দাওয়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া তবে বাড়ী গেল।

দিন তিনেক পরে।

ঘনশ্যাম সকালেই আসিয়া দাওয়ায় বসিল—কই কি হচ্ছে গো?

সরস্বতী হাসিয়া বলিল—এস লাগর এস।

বিনা ভূমিকায় ঘনশ্যাম বলিল—কি বুলছ বুল, এইবার?

মুখে কাপড় চাপা দিয়া সরস্বতী বলিল—কিসের গো?

—নিকার কথা। কি বুলছ বুল দেখি?

—উঁ—হু। সতীন নিয়া ঘর করতে লারব আমি!

—উকে যদি তালাক দি?

—হুঁ—তবে করব নিকা।

—দেখিয়ো!

—হুঁ গো! আমার কেলোসোনার দিব্যি। হ'ল তো?

—কিন্তু তুমি এমন ক'রে বেড়াতে পাবে নাই।

—বেশ।

কথায় কিন্তু বাধা পড়িল; নাতি-সম্প্রদায়ের অন্যতম নাতি দ্বিজপদ আসিয়া উপস্থিত হইল—কই? রাঙাদিদি কই?

—এস, এস, ভাই এস। সরস্বতী হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল।

ঘনশ্যাম উঠিয়া গেল। দ্বিজপদ বসিয়া বলিল—তারপরে?

হাসিয়া সরস্বতী উত্তর দিল—আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো। হা নটে তুই—

অপ্রতিভ হইয়া দ্বিজপদ হাসিয়া বলিল—ধ্যেৎ?

—কেনে—ধ্যেৎ কেনে?

—বুড়া দাদু তো গেলো, তুমি কি করবে—শুধাতে এলাম—তা—ন—

—বুড়া মরেছে। আমি নেকা করব।

—হুঁ—তা

—উঁ—হু। সতীন নিয়া আমি ঘর করতে লারব হে তুমি উঠে যাও।

—আমি যদি তালাক দিই?

—তখন এস; পিঁড়ি পেতে রাখব আমি। এখন উঠো, আমি যাব গোপালপুর, জমিদারবাবুর পুতুলের বরাত আছে—।

সে ডালা সাজাইয়া দুয়ারে তালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তালা দিতে

গিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। বুড়া ওই ঠাঁইটিতে বসিয়া আঁকিত। তালাচাবীর অভ্যাস তাহার নাই।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

গোপালপুরের পথে হাঁক উঠিল—চা—ই, রেশমী চুড়ি।

কিন্তু জমিদার-বাড়ীর জানালা আজ খুলিয়া গেল না। কোথাও এতটুকু শব্দ হইল না, বাতায়ন-পথগুলি সবুজরঙের কপাটে ভাঁজ মিলাইয়া নীরন্ধ্র, গৌরচাঁদ চলিয়া গিয়াছে।

পটুয়াপাড়ার প্রায় প্রতিঘরেই একটা অবরুদ্ধ কান্না গুমরিয়া মরিতেছিল। তরুণী বধূগুলি গোপনে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে; কিন্তু কেহ কাহারও কান্নার কথা জানে না। তাদের স্বামীরা তাহাদিগকে তালাক দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আশ্চার্য্যের কথা—সরস্বতী না মরিয়াও তাহাদিগকে রেহাই দিল।

সকালে উঠিয়া সকলে দেখিল—সরস্বতী নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নাতিরা সকলেই পরস্পরের সন্ধানে চাহিয়া পরস্পরকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল; তাহারা সকলেই আছে—সে-ই নাই।

সকলেই ছুটিল—তালাকের আর্জ্জি ফিরাইয়া আনিতে। মেয়েরা চোখের জল মুছিয়া গালিগালাজে শতমুখী হইয়া উঠিল।

সরস্বতী বলিয়া তাহাকে কেহ চেনে না। শহরে রাঙাদিদির চুড়ি ও মাটির পুতুলের দোকান বিখ্যাত।

পাকা আমের মত গৌরবর্ণা প্রৌঢ়া রাঙাদিদির খরিদ্দারেরা নিত্য তাহার জিনিষ কেনে। সাত-আট বছরের ছেলেমেয়েরা নিত্য পুতুল ও চুড়ি ভাঙে, নিত্য কেনে।

—কি চাই ভাই, পক্ষীরাজ ঘোড়া? কালকেরটা রাক্ষসে খেয়ে নিয়েছে?
—কি দিদি—আজ কি পরবে? মনচোরা না নীলমাণিক?
লোকে বলে বুড়ী পটুয়ানীর অগাধ পয়সা।

'বাণী মা'

আমার মেয়ে বাণী। পাঁচ পার হইয়া সবে সে ছয়ে পা দিয়াছে। হঠাৎ তাহার জীবনে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সে পাকা গিন্নী হইয়া উঠিল। সংসারের সকলেই আমাকে সে জন্য দায়ী করিলেন—বলিলেন,—বাপের আদরেই মেয়েটির মাথা খাওয়া গেল।

বিবরণটা এই। বাণীর আগে আমার আর একটি মেয়ে হইয়াছিল—কালো মেয়ে, একটি চোখ ট্যারা, তার নাম দিয়াছিলাম 'বুলবুল'। বুলবুল শেষে সংক্ষিপ্ত হইয়া বুলুতে পরিণত হইয়াছিল। সেই বুলু অকস্মাৎ একদিন চলিয়া গেল। প্রথমটা সে আঘাতে পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলাম। এখনও মধ্যে মধ্যে মনে হয়, অপূর্ব্ব সে আঘাত। মানুষ যে কতখানি ভালবাসিতে পারে শোকে নির্ম্মম আঘাত না পাইলে সে উপলব্ধি মানুষ করিতে পারে না। নারিকেলের ছোবড়া ও খোলার মত হৃদয়ের আবরণটা না ভাঙিলে অন্তঃস্তলের শস্য এবং পানীয়ের অমৃতরসের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কিন্তু শোক চিরদিন থাকে না। চিরদিন কেন, শোক বোধ করি সুখের চেয়েও স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। শোক আস্বাদে অতি তীব্র অপূর্ব্ব, তাহার প্রভাব অতি পবিত্র। শোক মানুষকে উদার করে, পঙ্কিল হীনতার ঊর্দ্ধ লোকে লইয়া যায় তাই শোক স্বল্পদিন স্থায়ী। মানুষ টানিয়া টানিয়া শোকাহতকে নীচে নামাইয়া আনে। প্রকৃতিও পরিহাস করিয়া তাহাকে

নিম্নলোকে ঠেলিয়া দেয়। আমাকে যে অত্যন্ত সবলে শোকের রাজ্য হইতে টানিয়া নীচে নামাইল—সে ওই বাণী।

বাণীর বয়স তখন সবে চার বৎসর। বুলুর অদর্শনে সে কাঁদিল কিন্তু আমার কান্না তাহার সহ্য হইল না—সে আমার কোলে আসিয়া চাপিয়া বসিল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সঙ্কোচভরে ডাকিল, —বাবা!

ডাকটি বড় মিষ্টি লাগিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াও ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিলাম—মা!

—আমার নাম কি, বাবা?

বুলবুলের নাম দিয়াছিলাম—বুল্‌বুল্-তুল্‌তুল্—ফুল্‌ফুল্—টুলটুল ইত্যাদি! ছড়াটা অনেক বড় ছিল কিন্তু বুলবুলের স্মৃতির সহিত সে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। বাণী অভিমান করিয়াছিল, সুতরাং তাহারও নাম রচনা করিতে হইয়াছিল। বাণী সেই নামের ছড়া শুনিতে চাহিল।

আমি বলিলাম,—বাণী মা, রাণী মা, মণি মা, ধনি মা, চাঁদিমা-রাঙিমা, লালিমা নীলিমা, মহিমা-গরিমা, সুরমা-সুষমা, মাসীমা-পিসীমা-মাগো-মা-মা-মা! সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম।

সে আমার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না। যে মেরেছে তোকে, আমি মারব তাকে!

সেইদিন হইতে সে আমার মা হইয়া উঠিয়াছে।

সতীন্ শব্দের অর্থ সে নিশ্চয় জানে না—কিন্তু আমার মাকে বলে সতীন্। কথাটা আমিই শিখাইয়াছি। অর্থ না জানুক কিন্তু মা আমার মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত তাঁহার সন্তানের দাবী লইয়া ঝগড়া করেন—সেজন্য সে সতীনের মতই মায়ের ঈর্ষা করে।

যদি জিজ্ঞাসা করি—বাণী মা, বাড়ীর মধ্যে দুষ্টু কে?

সে এদিক-ওদিক দেখিয়া চুপি চুপি বলে—ঠাকুমা।

যাক্ এ ত সব খুঁটিনাটির কথা। সে ঈর্ষা তাহার দিন দিন বাড়িতেছে। সে ঈর্ষা বাড়িয়া এখন এতদূরে উঠিয়াছে যে,—সে এখন সংসারের কর্ত্রীর পদ দাবী করিতেছে ফ্রক সে পরে না, কাপড় পরা চাই, আঁচলে চাবী বাঁধা চাই, মাথায় অল্প ঘোম্‌টা টানিয়া সে আমার মায়ের প্রত্যেক কর্ম্মটির অনুকরণ করে। বাহিরে কোন জিনিষ পড়িয়া থাকিলে সে তৎক্ষণাৎ সেটাকে টানিয়া এমন স্থানে রাখিয়া দেয় যে খুঁজিয়া বাড়ীর লোক সারা হইয়া যায়। বাণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, আমি তুলে রেখে দিয়েছি! এমনি করে কি ফেলে রাখে! যদি কেউ নিয়ে যেত!

বলিয়া সে আরও কত কথা বলিতে বলিতে আপন খেলাঘরে গিয়া আপনার আঁচলের চাবী দিয়া ঘরের দরজা খোলে—কুটুস্-কুলুপ! তারপর সেটাকে বাহির করিয়া আনে। এই খেলাঘর যে তাহার কয়টা তাহার হিসাব কেহ জানে না। আর স্থান পরিবর্ত্তন তো অহরহ হইতেছে।

সেদিন বাড়ীর মেয়েদের নিমন্ত্রণ ছিল এক বিবাহবাড়ীতে। মা বলিলেন —বাবা, বউমা'র গহনার বাক্সটা যে বের ক'রে দিতে হবে।

বাহির করিয়া দিলাম। বাণী চীৎকার আরম্ভ করিল—আমার গয়না?

আমার মা নিজের নিরাভরণা মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন,—তুই যে বলিস তুই আমার সতীন—তোর বাপের মা—তুই গয়না পরবি কি? আমি গয়না পরেছি? আমার সতীন হ'য়ে গয়না পরবি কি তুই?

সে তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—আমি সতীন হব না।

অতঃপর গহনা বাহির না করিয়া দিয়া উপায় রহিল না।

সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আসিয়া দেখি হুলস্থূল কাণ্ড। বাণী কাতরভাবে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে—আর বাড়ীর সকলেই বলিতেছে—ওর বাপই আদর দিয়ে ওর মাথাটি খেলে!

ব্যাপার শুনিলাম,—বাণীর মা বিবাহ-বাড়ী হইতে আসিয়া আপনার ও বাণীর গহনাগুলি খুলিয়া বাক্সতে বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়াছিলেন।

সেই গহনার বাক্স অকস্মাৎ এক সময় অন্তর্হিত হয়। বাড়ীর সমস্ত লোক যখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে—তখনই বাণী কোথা হইতে আসিয়া নিজের মাকে বলে—তোমার কাণ্ড বটে মা! এমনি করে গয়নার বাক্স নাকি—?

আর যায় কোথা—গহনা-শোক-বিহ্বলা বাণীর-মা আসিয়া তাহার পিঠে দুম্‌দাম্ শব্দে কিল-চড় বসাইয়া দিয়াছে। গহনার বাক্স অবশ্য পাওয়া গিয়াছে।

বাড়ীতে সমালোচনার আর অন্ত ছিল না। তখনও পর্য্যন্ত মেয়েটিকে কেহ স্নেহ-সম্ভাষণ করে নাই। সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল—আমাকে দেখিয়া হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমার এ দৃশ্যটা অত্যন্ত নির্ম্মম বলিয়াই মনে হইল—আমি রাগ করিয়াই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম।

মা বলিলেন—আর আদর দিয়ো না বাবা, একটু শাসন করা দরকার।

ঘোমটার মধ্য হইতে বাণীর মা বলিলেন—ওই তো আদর দিয়ে মাথাটি খেলে!

আমি কোন কথা না বলিয়া বাণীকে বুকে করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার বাড়ীতে ফিরিতেই মা বলিলেন—গহনার বাক্সটা যে সিন্দুকে তুলে রাখতে হবে বাবা!

আমার মনের ক্ষোভ তখনও মেটে নাই। আমি বলিলাম,—আমি পারব না।

মাও এবার রাগ করিয়া উঠিলেন—না পার, নাই পারবে বাবা। যায় তোমাদেরই যাবে।

ঘরের ভিতর হইতে বাণীর মা বলিলেন,—মেয়ে আর কারও হয় না, ছেলেপুলে আর কারও মরে না! সে তো আমারও সন্তান ছিল, না—একা ওরই ছিল।

উগ্র ক্রোধ প্রাণপণে দমন করিয়া বসিয়া রহিলাম—কোন উত্তর দিলাম না। বাণী এতক্ষণে শান্ত হইয়াছিল। সে আপন মনেই ঘুরিয়া খেলা করিতে লাগিল। বাণী শান্ত হইল কিন্তু তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাড়ীতে যে ঝটিকাবর্ত্ত উঠিয়াছিল তাহা শান্ত হইল না। শিশুতে এবং বয়স্কতে এইখানেই পার্থক্য! এমন কি, বাড়ীতে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত হইল না—রাগ করিয়া মা শুইতে চলিয়া গেলেন। একই বিছানায় নির্ব্বাক হইয়া আমরা স্বামী-স্ত্রীতে শুইয়া রহিলাম। বাণী কিছুতেই মায়ের দিকে শুইল না। আমার পাশে আসিয়া সে আবার ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঘটনার পরিণতিটা এতদূর আসিয়াই যদি সমাপ্ত হইত তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতাম। নির্ম্মম ভাগ্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর পরিহাস করিবার জন্যই এমনি ক্রোধান্ধ করিয়া সমগ্র সংসারটিকে শোচনীয় পরিণামের পথে চালিত করিতেছিল আমরা বুঝিতে পারি নাই।

সকালেই দেখা গেল, চোরে ঘরে সিঁধ কাটিয়াছে। মাটির ঘরেই কাপড়ের বাক্স-পেঁট্রা ছিল সেগুলি তচ্‌নচ করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়াছে।

স্ত্রী বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন! গহনার বাক্সও যে কাপড়ের বাক্সের উপরেই ছিল। গত রাত্রের অশান্তির তাড়নার ফলে তিনিও রাগ করিয়া বাক্সের উপরেই গয়নার বাক্স ফেলিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।

মা বলিলেন—ওগো আমার বুক যে কেমন করছে গো! ও মাগো!

আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

পাড়া-প্রতিবেশী আসিয়া আমাকেই দোষ দিল। রাগ করিয়া এত টাকার গহনা বাহিরে রাখিয়া দেওয়া আমার উচিত হয় নাই, আর গহনা-গহনা করিয়া এতটা গোলমালের পর। আবার এতটা চেঁচামেচি যদি না হইত তবে এমন হইত না। ঘরের লোকে চাকর-বাকরেই কেহ না কেহ সন্ধান দিয়াছে। আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

মা বলিলেন—ওই মেয়েটি অত্যন্ত কুলক্ষণা! ওর থেকেই এই হ'ল।

পাড়াপ্রতিবেশীরা সায় দিল—একজন বলিল—ওরই দৃষ্টি-দোষে সে মেয়েটা গিয়াছে!

একজন বলিল—সে আর কি করবে বল! এখন পুলিশে খবর দাও।

—হ্যাঁ; মনে ছিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহির হইলাম।

—বাবা!

দারুণ দুর্দ্দান্ত ক্রোধে আমার অন্তরটা সারা হইয়া উঠিল। সকল অনর্থের মূল ওই অলক্ষণা মেয়েটা আবার পিছনে ডাকিতেছে! ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

বাণী পিছনের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল—গহনার বাক্স আমি রেখে দিয়েছি বাবা। মায়ের যে কাণ্ড—!

—কোথায়! কোথায়?

—সেই চান ঘরের পাশে চোরকুঠুরীতে আমার খেলাঘরে। কুলুপ দিয়ে—।

তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে তুলিয়া বলিলাম—কই বের করে দেবে চল তো মা।

সে বলিল—সেই মা যখন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল তখুনই আমি দেখলাম। দেখে—বলি সামলিয়ে রেখে দিই!

খেলাঘরেই বাক্সটি দেখিলাম। তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইতে গেলাম—কিন্তু বাণী বাধা দিয়া বলিল—দাঁড়াও কুলুপ খুলি!

বলিয়া সে শূন্যে চাবী ঘুরাইয়া মুখে শব্দ করিল—কুটুস্—কুলুপ—!

হোলি

রাস্তা হইতেই বাড়ীটা বেশ পছন্দ হইল, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন-রোডের জংসনের উপরেই তিনতলা বাড়ী। সামনে দক্ষিণে পার্ক; দক্ষিণের বাতাস প্রচুর পাওয়া যাইবে। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাড়ীখানি বেশ ঝরঝরে, এমন কি নিচের তলাতেও ধরিত্রীগর্ভের ভোগবতীর

করুণা বেগবতী নয়। দোতলায় উঠিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা রহিল না, বারান্দাটাই মন হরণ করিয়া লইল ;—শুধু আরামপ্রদই নয় ; বেশ একটি আভিজাত্যও আছে। বসন্তকাল—সন্ধ্যায় একখানা ঈজিচেয়ার পাতিয়া বসিলেই—স্বর্গসুখ না হউক—ত্রিশঙ্কুলোকের সুখটা অন্তত পাওয়া যাইবে।

সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন. তিনি বলিলেন,—বেশ জায়গা, এইখানেই জমিয়ে ব'স।…কি, চুপ ক'রে রয়েছ যে ?

মেস, বাসা, বা একখানা ঘর—মোট কথা একটা 'মন্দ-নয়-গোছের' আশ্রয় খুঁজিয়া আমিও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম—ওতে আর কথা নেই ব'লেই ত চুপ ক'রে আছি।

আসলে মনে মনে আয়ব্যয়ের হিসাব কষিয়া দেখিতেছিলাম—নীচের অঙ্কটা প্লাস, কি মাইনাস কি ব্যোমচিহ্নে দাঁড়ায়। বন্ধুও একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন—নামটা কিন্তু শান্তিভবন না হয়ে শান্তিকুঞ্জ হ'লে ভাল হ'ত। লেখায় খানিকটা ইনস্পিরেশন পাওয়া যেত।

বলিলাম—মরুক গে, what's in a name, ব'লে দ্বিগুণিত উৎসাহে লেগে পড়া যাবে।

বন্ধু বলিলেন—বাস্, তবে চল, টাকা জমা দিয়ে ফেল ; কালই এখানে চ'লে এস।

একটু চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—কাল আবার দিনটা কেমন আছে—

বাধা দিয়া বলিলাম—অরক্ষণীয়া হ'লে তার আর অকাল নেই, অশ্রয়হীনের পক্ষে দরজা খোলা পেলেই গৃহপ্রবেশের লগ্ন। এতে আর পাঁজি দেখবার দরকার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে টাকা জমা দিয়া নয়-নম্বর ঘরখানি পছন্দ করিয়া ফেলিলাম এবং একটা অরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। বাত্যাতাড়িত পত্র-জীবনে 'স্পীড়' আছে সত্য, কিন্তু তার চেয়ে মৃত্তিকাতলস্থ হইয়া বিগলিত হওয়াও

আরামের, খানিকটা আমিরী আছে—দিন রাত্রি ঘুমাইলেও কেহ কিছু বলিবে না।

বেশ জায়গা, একেবারে খাঁটি শহুরে আবহাওয়া। কাহারও উপর কাহারও আগ্রহ নাই, কিন্তু প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের সন্দেহ আছে। এক মিনিটের জন্য বাহিরে যাইতে হইলেও দরজায় তালা পড়ে। পরিচয়ও বড় কাহারও সহিত কাহারও নাই, যে যাহার আপন আপন ঘরের মধ্যেই থাকে। দেখাশুনা এক হয় সিঁড়িতে, কিন্তু সিঁড়িটা অন্ধকার বলিয়া এক জায়গায় থাকিয়াও কথা-না-বলার জন্য চক্ষুলজ্জাও ঘটিতে পায় না। আর দেখাশুনা হয় খাবার ঘরে, কিন্তু সেখানে হাত এবং মুখ দুই ব্যস্ত থাকে, কাজেই কথা বলা চলে না—করমর্দ্দন করাও হয় না। কয়টি প্রাণী মাত্র সর্ব্বজনপরিচিত—কালী, নরেশ, ভজ এবং লোচন। সকলে ইহাদের বিশ্বাসও করে; সে অবশ্য বাধ্য হইয়া, কারণ উহাদের দুইজন চাকর, অপর দুইজন ঠাকুর। আর একটি প্রাণী—একটা লাল রঙের বিড়াল—সে সব ঘরেই যায়, আপন ভাষায় দুই একটা কথাও বলে, কখন কখন কাপ ডিসও ভাঙে, কোন কোন দিন পাশে শুইয়া গলা ঘড়ঘড় করিয়া আদরও জানায়। আমি উহার নাম দিয়াছি—'রাঙা-সখী'।

আর একজন সর্ব্বপরিচিত আছেন, কিন্তু তিনি নিজে নির্ব্বাক। প্রায়-বৃদ্ধ শীর্ণ—দীর্ঘকায় লোকটির নাকটি খাঁড়ার মত তীক্ষ্ণ,কুঞ্চিত ললাটে, চোখের দৃষ্টিতে যেমন চিনাইয়াও দেয়, তেমনই যেন বলিয়াও দেয়—'দূরমপসর'।

প্রথম দিনই তাঁহাকে চিনিলাম। রাত্রে খাবার ঘরে একটা কোণে ভদ্রলোক খাইতে বসিয়াছিলেন, খাইবার স্থানটিও দেখিলাম একটু স্বতন্ত্র। প্রথমেই ভজহরি তাঁহার খাবার আনিয়া দিল। তিনি প্রথমে থালাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইলেন, তারপর একবার ভজহরির দিকে সেই দৃষ্টিতে চাহিলেন! তারপর নিঃশব্দে থালাটা একটু টানিয়া লইয়া আহারে মনোনিবেশ

করিলেন। আরও কয়জন খাইতে বসিয়াছিলেন, সকলেই দেখিলাম একটু সন্ত্রস্ত হইয়া গেলেন। ভদ্রলোক নীরবেই আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

কালী চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও ভদ্রলোক কে কালী?

কুঁজায় জল দিতে দিতে কালী বলিল, কে বলুন দেখি?

—ওই যে গায়ের রং খুব ফরসা—লম্বা মানুষটি!

—নাকটা খুব ধারালো—ওই উনি তো?

নাকে ধার আছে কিনা জানি না, তবে খাঁড়ার মত বলে বটে ওরকম নাককে।—অনেকক্ষণ কথা না বলিয়া কেমন যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলাম, কালীর সহিতই রসিকতা করিয়া যেন একটু হাল্কা হইলাম। কালীর বোধশক্তি কম বলিয়াই ভাল চাকর হিসাবে খ্যাতি আছে। সসম্ভ্রমে চাপা-গলায় উত্তর দিল—ওরে বাপরে! আগুনের মত লোক বাবু! রাগলে আর রক্ষে নাই। তবে কারু সঙ্গে ছোঁয়াচ নাই, ওই আপিস যান, আর এসে আপনার ঘরটিতে বাস্।

তারপর ইঙ্গিতে পাশের ঘরটা দেখাইয়া দিল। বুঝিলাম পাশের ঘরেই আছেন তিনি। আমিও চাপা গলায় বলিলাম,—কিন্তু লোকটি কে কালী—সে কথা তো বললে না?

—নাম তো জানি না বাবু, তবে এখানে সবাই বলে বিশ্বামিত্ত ঋষি। এখানে আছেন উনি অনেক দিন থেকে, আমি আসবার আগে থেকেই আছেন। আমি এসে ঐ নামই শুনছি। কিন্তু ও তো মানুষের নাম হয় না—উনি রাগী ব'লেই বলে। তবে চাকরি করেন মোটা।

সে পরিচয়ও পাইলাম, পরদিন দশটার সময় দেখিলাম—দামী একটা স্যুট পরিয়া ভদ্রলোক বাহির হইয়া গেলেন। বোর্ডিঙের দরজায় একটা ফিটনও দাঁড়াইয়া ছিল। বৈকালেও ফিটনেই ফিরিলেন। দেখিলাম—আমার পাশের ঘরেই ভদ্রলোক থাকেন। একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। স্বর্গলোক দূর

বলিয়াই দেবতা করুণাময়, মানুষকে আশীর্ব্বাদ করেন। পাশাপাশি বাস করিতে হইলে ঘেঁষাঘেঁষির অপরাধে অভিশাপেই একদিন নরলোক পরলোকবাসী হইত, ইহাতে বোধকরি কেহই সন্দেহ করিবে না।

মরা-গাছকে কবিরা বলিয়া থাকেন 'নীরস তরুবর'; কিন্তু গল্প লেখকের কাছে বিশেষণের উপর প্রসাধন চলে না, সেখানে 'শুষ্কং কাষ্ঠং'-টাই ভাল। আমি ওঁর নামকরণ করিলাম 'শুষ্ক কাষ্ঠ'। প্রথম কয়েক দিন উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া বুঝিলাম, একেবারে শুধু শুষ্কই নয়, সার বলিয়াও ভিতরে কিছুই নাই—চিরিয়া কাঠের পুতুলও গড়া যাইবে না। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া গল্প লিখিতে বসিলাম! কিন্তু সেও খুব সহজ হইল না। বিঘ্নরাজ যেন সহসা মহামহোপাধ্যায় হইয়া উঠিয়াছেন। ট্রামের শব্দ, বাসের গর্জ্জন—ও দুইটা কোন ক্ষতি করে না, গৃহপালিত জানোয়ারের মত কলরবই করে, ডাক দিতে পারে না। কিন্তু এ কয় দিনে—রাষ্ট্রপতির শোভাযাত্রার বীরনাদে, মোহরমের সমারোহের জয়ধ্বনিতে আমার মনের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে। রাস্তায় মানুষের কলরব মনের কান ধরিয়া টান দেয়, লেখা ফেলিয়া ছুটিয়া যাই অভিনব একটা কিছু দেখিবার প্রত্যাশায়। মধ্যে মধ্যে পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া বিশ্বামিত্র আবার দরজাটা বন্ধ করিয়া দেন। কয়েক বার লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ললাটে নব কুঞ্চনরেখা দেখা দিবার আর স্থান নাই। ভদ্রলোক অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

এত বিঘ্ন সত্ত্বেও লেখাটা কিন্তু শেষ হইল। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কারণ মোহরমের পরই হোলি, মহাত্মার আগমন,—জয়ধ্বনির টেম্পারেচার হু-হু করিয়া উপর দিকে উঠিবে। লেখা শেষ হইতেই খুশি হইয়া টেলিফোন যোগে কয়েকজন বন্ধুকে সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ জানাইয়া ফেলিলাম। লেখা শুনিয়া বিচার করিয়া মতামত দিবেন। ডাব বরফ ও চা সিগারেটের বন্দোবস্তও

ভাল করিয়াই করিলাম। এখানে আমি অতি সনাতনপন্থী—মেয়ে দেখাইয়া আসরে মিষ্ট মুখের প্রয়োজন বিশেষ করিয়াই স্বীকার করি।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আসর জমিয়া উঠিল। সকরুণ করুণ রসের গল্প এবং সে অল্পও নয়—এক্সারসাইজ-বুকের উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা। বাংলা দেশে করুণ রসই জমে ভাল; আর তা ছাড়া আর আছেই বা কি? বাংলার তারুণ্যকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সে তারুণ্য রাম-লক্ষ্মণের মত নাগপাশে বন্দী। বাকি যাঁরা, তাঁরা সত্যকার জোরের অভাবে ভাবের ঘরে চোরের মতই কলরব করেন। তাঁদের আস্ফালন প্রলাপের মত অর্থহীন, বিলাপের মতই করুণ। তার চেয়ে সত্যকার অর্থপূর্ণ করুণ রসই ভাল। দুঃখের পর দুঃখ, মৃত্যুর পর মৃত্যু,—উনপঞ্চাশ পাতায় সাতটি মৃত্যু আমি ঘটাইয়াছিলাম; সুতরাং রসের সপ্তম স্বর্গে গল্প আমার উঠিয়া গিয়াছিল। শেষ হইলে সকলের চোখ ছল ছল করিতেছে দেখিলাম।

একজন আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—সত্যিকার রং তোমার আছে—দোকানের কেনা রং নয়।

অপর একজন বলিলেন,—এ-ই জীবন।

যাক, সকলকে বিদায় দিয়া পরিতৃপ্ত মনেই বারান্দায় ঈজিচেয়ারে বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিলাম।

—আপনিই পাশের ঘরে থাকেন?

প্রশ্ন শুনিয়া মাথা তুলিয়া দেখিলাম—বিশ্বামিত্র ঋষি! সেই বিরাক্তভরা মুখ, কুঞ্চিত ললাট, তিক্ত দৃষ্টি! আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি করেন আপনি?

সবিনয়ে বলিলাম—আমি একজন লেখক!

—হুঁ। কিন্তু এত চীৎকার ক'রে পড়াটা আপনার উচিত নয়। পাশের প্রতিবেশীদের জন্যে আপনার বিবেচনা থাকা দরকার।

গল্পটা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতামত পাইলে হয়তো কলহ করিয়াই বসিতাম; কিন্তু প্রাপ্তির ভারে মনটা ছিল অবনত, সুতরাং বিনীতভাবেই বলিলাম—মার্জ্জনা করবেন, সত্যিই আমার দোষ হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন আর হবে না।

ভাবিয়াছিলাম, ইহার পর আর জমিবে না, ভদ্রলোক চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন; কিন্তু আমাকে বিস্মিত করিয়া তিনি একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমিও বসিলাম। ভদ্রলোক বলিলেন,—আজ যেটা পড়লেন, ওটা আপনার লেখা?

আরও একটু খুশি হইয়া বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন—কিন্তু এ কি সত্যি?

উত্তর দিলাম—বাংলার পল্লীর সঙ্গে পরিচয় থাকলে দেখতেন, এতটুকু অতিরঞ্জিত করি নি আমি। বাংলার দুঃখের—

অসহিষ্ণু হইয়া তিনি বলিলেন,—সে প্রশ্ন আমি করছিনা। ও আর কি দুঃখ, একের পর এক ক'রে তিনবার সংসার ক'রে আটটা ছেলে, তিনটে স্ত্রী এগারোটা আমার গেছে; ও আমি জানি। কিন্তু তা ব'লে আনন্দ, সুখ, শোক, দুঃখ—এগুলো কি সত্যি?

একটু বিব্রত হইয়া পড়িলাম; ভাবিতেছিলাম, কি উত্তর দিব। তিনি আবার অসহিষ্ণুর মতই বলিলেন,—কি বলেন আপনি?

এবার বলিলাম—সত্যি বই কি! কারণ এইগুলোই তো জীবনকে চালিত করছে।

তিনি ঘৃণাভরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনি অতি নিকৃষ্ট জীব!

বলিয়াই তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমি অবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই নীচে একটা কলরব শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলাম;

ভিতরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, গুটি তিরিশেক ছেলে নিজেরাই বাক্স বিছানা মাথায় করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিতেছে। কালী বলিল,—মাট্রিক পরীক্ষা দেবে সব! এইখানে বাসা নিয়েছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বোর্ডিংটার চেহারা পাল্টাইয়া গেল।

—In this age—newspaper—newspaper—

কিছুক্ষণ পরেই একজন শিক্ষক আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বোর্ডিঙের বোর্ডে আমার নাম দেখিয়া আমার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছেন। তিনি নাকি ধন্য হইলেন, আমিও অবশ্য পুলকিত হইলাম। তাঁহারই কাছে শুনিলাম,—ফিস্ ফিস্ করিয়া তিনি বলিলেন, Newspaper Essayটা এবার এসে গেছে মশায়। খুব গোপনে আমরা জানতে পেরেছি।

হাসিয়া বলিলাম,—ছেলেদের মনে মনে পড়তে বলুন তা হ'লে।

তিনি বলিলেন—না, চেঁচিয়ে পড়লেই মুখস্থ হবে চট ক'রে।

ভোর তিনটার সময় একটা কোরাস জাতীয় চীৎকারে ঘুম ভঙিয়া গেল, শুনিলাম—newspaper newspaper.

উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শেষরাত্রির কলিকাত শান্ত, নিস্তব্ধ, প্রশান্ত—একটা বিরাট জীবন ঘুমঘোরে অচেতন। অপূর্ব্ব অদ্ভুত অনুভূতিতে মন ভরিয়া গেল। ইচ্ছা হইল, এই ঘুম-রহস্যাচ্ছন্ন পুরীটির পথে পথে একবার বেড়াইয়া আসি। মুখ হাত ধুইতে গেলাম। দেখিলাম, কল-ঘর বন্ধ, ভিতরে 'ওয়াক,—ওয়াক, এও—এও' শব্দে স্থানটা মুখরিত। কেহ যেন উদরের মধ্য হইতে অন্ত্রপাতি বাহির করিয়া ধুইয়া লইতেছে। ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরই খড়মের শব্দ শুনিয়া দেখিলাম, বিশ্বামিত্র ঋষি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া ফিরিতেছেন। এদিকে ততক্ষণে রাস্তায় ময়লা-গাড়ি চলিতে শুরু করিয়াছে, আঁকশি কাঁধে করিয়া জনকয়েক উড়িয়া ছুটিয়াছে রাস্তার আলো নিভাইতে।

—ছেলেগুলো লাইফ ইম্পসিবল্ ক'রে তুলেছে।

আমি একটু হাসিলাম। তিনি বলিলেন,—দেখুন, কাল সন্ধ্যবেলা আপনাকে রূঢ় কথা বলেছি।

এ কথারও কোন উত্তর দিলাম না। অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভদ্রতাটা মাত্রাতীত গুণ্ডামী।

তিনি আবার বলিলেন,—বেদ-বেদান্ত মায়া-বাদফাদ আমি আওড়াই না। ওসব আমি পারিও না। এ হ'ল আমার জীবনের রিয়েলাইজেশন—আনন্দ সুখ, শোক-দুঃখ—কোনটাই আমাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। আমি বেশ আছি।

সংসারের মত লইয়া তর্ক করার চেয়ে পাওনা-গণ্ডা লইয়া কলহ করাকেও আমি শ্রেয় বোধ করি, সুতরাং একথারও জবাব দিলাম না। আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ত্রয়োদশীর চাঁদ অস্ত যাইতেছে। কাল ত' বাসন্তী-পূর্ণিমা—দোল হোলি। এক মুহূর্ত্তের জন্য স্ত্রীকে মনে পড়িয়া গেল।

তিনি আবার বলিলেন,—আপনার নামটী কি?

নাম বলিলাম।

তিনি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—কোথায় বাড়ী?

সে পরিচয়ও দিলাম।

তিনি অকস্মাৎ হাতটা ধরিয়া বলিলেন,—তুমি হীরুর জামাই?

আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, বলিলাম—তাঁকে কি আপনি জানতেন?

—জানতেন? তুমি একটি হনুমান। আমি যে হীরুর কাকা।

—তাঁর কাকা?

—হ্যাঁ গো। মানে, তুমি আমার নাত-জামাই। আমার বাবা ছিলেন আমির কুলীন, ষাটটা বিয়ে করেছিলেন তিনি, জান তো? তোমার দাদাশ্বশুর আর আমি হলাম সৎ-ভাই। কানাই মুখুজ্জের নাম শুনেছ?

—আপনি?—তাড়াতাড়ি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন—আমি।

গল্পের মতই ইহার কাহিনী শুনিয়াছি। এককালে ইনি লক্ষপতি হইয়াছিলেন খনিজ সম্পদের ব্যবসায়ে। শুনিয়াছি, রূঢ় তাগাদার জন্য একজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু টাকার জোরে চাকা ঘুরিয়া গিয়াছিল। আবার সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার কাহিনীও শুনিয়াছি। এখন দালালি করেন বোধ হয়। কয়েকটা কুশলপ্রশ্ন করিয়াই তিনি ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

সন্ধ্যায় বারান্দায় বসিয়া ছিলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন,—দোলে বাড়ী যাবে না?

—না।

—ইডিয়ট কোথাকার! রমা কার সঙ্গে রঙ খেলবে?

—আপনি যান বরং আমার হয়ে।

—ওরে রাস্কেল! আমি না হয় তার দেহে রঙ দিতে পারি, তুই না হ'লে তার মনে রঙ ধরাবে কে?

—কাজ রয়েছে দাদু, উপায় নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—উঃ, আমাদের সে এক হোলিখেলা ছিল; বাগানবাড়ি, মদ, বাঈজী,—জলের মত টাকা খরচ করেছি! জীবনে ট্রাজেডি ঘটবার পরও করেছি; কিন্তু সুখ-আনন্দ কোথায়? সেই জন্যেই তো জানি ওসব মিথ্যে!

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন,—তুমি তো সিগারেট খাও! খাও, খাও, লজ্জা করো না। জান তো, 'ইয়ারের বয়স হয় না জাঁহাপনা'। আমি তোমার ইয়ার।

তবুও সিগারেট খাইতে পারিলাম না।

তিনি উঠিয়া বলিলেন,—নাঃ, তোমার কষ্ট হবে, আমিই উঠি।

আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—টাকাকড়ির অভাবেই কি বাড়ি যাচ্ছ না তুমি? আমি দিচ্ছি, এখনও লাষ্ট ট্রেন ধ'রে যেতে পারবে।

উঠিয়া বলিলাম,—না দাদু, সত্যিই আমার কাজ রয়েছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, দাদুর ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। একবার ডাকিলাম,—দাদু!

ভিতর হইতে উত্তর আসিল,—শরীর খারাপ, বিরক্ত ক'র না আমায়।

নীচে রাস্তায় কে চীৎকার করিয়া উঠিল,—এই, এই—না-না।

রেলিঙে বুক দিয়া ঝুঁকিয়া দেখিলাম, হোলি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ছেলের দল একটা গলির মোড় হইতে একজন ভদ্রলোককে তাড়া করিয়া চলিয়াছে। তিনি ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিতেছেন, না, না। আশেপাশের বোর্ডিংগুলিতে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমার মত দর্শকের দল অনেক। সকলেই রঙের ভয়ে বিব্রত, অথচ নীচের খেলা দেখিয়া বেশ হাসিতেছেন। আমাদের বোর্ডিংয়ের ছেলের দল রাস্তার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ও দৃষ্টি—ও হাসির অর্থ আমি বুঝি, সকলেই চায় ওই অমনই মাতামাতি করিতে। কিন্তু সমাজ-জীবনে বাধ্যবাধকতায় অভ্যাস-করা সংযম সঙ্কোচের রূপ ধরিয়া পথে দাঁড়াইয়াছে। আমি জানি ও সঙ্কোচ থাকিবে না; হোলির রঙ অকস্মাৎ একসময় বন্যার মত আবেগে সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিবে।

আরব বেদুইন হইবার সাধ তো একা মহাকবির নয়, শত বন্ধনে আবদ্ধ সমগ্র মানবজাতির অন্তরের কথা। হইলও তাই।

বেলার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত দৃশ্য, সমস্ত রাস্তাটা রঙ-মাখা মানুষে ভরিয়া গেল। বোর্ডিঙের বারান্দাগুলিতেও রঙ লইয়া মাতামাতি। সম্মুখের বোর্ডিংটিতে একটি প্রায়-প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মাথায় বাবরি চুল, কিন্তু মধ্যদেশে একটি টাক,—তাঁহাকে আমার বেশ লাগিল। তিনি মাখিয়াছেন অনেক রকম আবীর, রঙ, সোনালি রূপালি, লাল, নীল, বেগুনি, সবুজ, জর্দ্দা, তাহার সঙ্গে ধূলা-রঙও আছে। দুই হাতে তিনি রূপালি ধূলা-রঙ মাখিয়া সবিনয়ে সকলকে মুখে রং মাখিবার জন্য কাতর অনুরোধ করিতেছেন। ভাবে

বোধ হইল লোকে রঙ মাখিলে তিনি হাতে স্বর্গ পাইবেন। ক্রমে ক্রমে চারিদিক রঙে ভরিয়া গেল। রাস্তায় রঙ, ট্রামে রঙ, বাড়ীর দেওয়ালে রঙ, আমার মনের মধ্যে দেখিলাম সেখানেও রঙের আমেজ ধরিয়াছে।

পিছনে হৈ হৈ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, আমাদের বোর্ডিঙেও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তারপরই যুবকের দল, তারপর সকলেই। সমস্ত অপরিচয়ের প্রাচীর যেন আজ ভাঙিয়া গেল। শুধু ওই বিশ্বামিত্রের দ্বার রুদ্ধ! কিছুক্ষণ পরই বন্ধুর দল আসিয়া অমাকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। যখন রঙ খেলিয়া বাড়ি ফিরিলাম, তখন বেলা চারিটা।

দাদুর দুয়ার বন্ধই রহিয়াছে।

ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

দাদু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারটাও ভেজাইয়া দিলেন। আমি উঠিয়া বসিলাম।

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—রঙ কেমন খেললে?

—সে আর বলবেন না, তবে এ রঙ খেলা নয়, বেরঙের খেলা। কালি, আলকাতরা, কাদা,—এই বেশি।

টেবিলের উপর খানিকটা আবীর তখনও পড়িয়া ছিল, সেদিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, আবীরটাই হ'ল শ্রেষ্ঠ, কুম্‌কুমটা আরও ভাল—ওতে রঙের সঙ্গে কৌতুক আছে।

স্বীকার করিয়া বলিলাম,—তা ঠিক।

তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—একটা অনুরোধ করব তোমাকে, রাখবে বল?

আবেগভরেই বলিলাম,—অনুরোধ কেন দাদু?—আদেশ বলুন। আপনার আদেশ কি অমান্য করতে পারি?

—তবে বাক্স গুছিয়ে নাও, বাড়ী যাও; আটটার এক্সপ্রেসে গেলে বারোটায় বাড়ী পৌঁছবে। রমার সঙ্গে রঙ খেলে এস। চল, আমি তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।

আমারও মনটা কেমন রঙে ভরিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিলাম।

দাদু ততক্ষণে ট্যাক্সি ডাকাইয়াছেন। পথে গাড়ী থামাইয়া রমার জন্য বাসন্তী রঙের শাড়ি, আমার জন্য ধুতি, কুমকুম, আবীর, রঙ, পিচকারি কিনিয়া মিষ্টির দোকানে গাড়ী থামাইলেন।

আমি বলিলাম,—মিষ্টি আবার কেন দাদু?

তিনি বলিলেন,—শালা, তুই রমাকে খাইয়ে দিবি, রমা তোকে খাইয়ে দেবে।

তিনি নিজে টিকিট করিয়া ট্রেনে চড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—রমাকে আমার কথা বলবি।

চোরের মা

চুরির নেশা এই ডোম বংশটির রক্তের কণায় যেন জলের সঙ্গে মহামারীর বীজাণুর মত মিশিয়া আছে। আর তাহা পুরুষে পুরুষে বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েক পুরুষ ধরিয়াই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই ব্যবসায় তাহারা নিয়মিতভাবে করিয়া আসিতেছে। টাকা নয়, তৈজসপত্র নয়—শুধু ধান। ধানের মরাই হইতে সুকৌশলে ধান বাহির করিয়া লয়, ধানের গোলার দুয়ারে যেমনই তালা দেওয়া থাকুক না—সে তালা তাহারা খুলিয়া ফেলিবেই, এবং সুকৌশলে আবার বন্ধও করিয়া দিয়া যাইবে।

শশী ডোম এখন দলের নেতা, দীঘল ছিপছিপে শরীর, গতি যেন বায়ুর মত,

এক হাত ব্যবধান হইতেও তাহার পিছনে ছুটিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে ধরিতে পারে নাই। পুলিশের লোকে মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকে—'বেটা যদি সিঁদ দিতে আরম্ভ করত তবে আর রক্ষে থাকত না'। শশীও সে কথা বহুবার শুনিয়াছে, কিন্তু কখন সিঁদ দিতে সে চেষ্টা করে না। তাহাদের বংশানুক্রমিক চুরির ধারাপদ্ধতি ছাড়া অন্য ধারাপদ্ধতি তাহার ভাল লাগে না।

শশী বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহার ছেলে হাবল আসিয়া বলিল—আজকে তো আমাবস্তে রইছে গো; কালিতলায় ফিঙের পূজোটা দিলে না কেনে? আজ ওকে বার কর, বেশ তো ডাগর হইছে।

—হুঁ। শশী চিন্তাকুলভাবে বলিল—হুঁ। তারপর সে হুঁকাটি পুত্রের হাতে দিয়া বলিল,—পারবে—হ্যাঁরে, ফিঙে পারবে?

হাবল বলিল—পারবে না কেনে? সে একেবারে লাফ মারছে।

—হুঁ। তবে নিয়ে আয়, একটা পাঁঠা কিনে নিয়ে আয়; কালিতলায় যে পূজো আজকে।

ফিঙে অদূরে একটু আড়ালেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে আনন্দের আতিশয্যে সত্যই একটা লাফ দিয়া উঠিল।

ফিঙে শশীর দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠের সন্তান,—একমাত্র সন্তান। ফিঙের বাপ নিতান্ত শৈশব অবস্থাতেই মারা গিয়াছে। ফিঙের মা তাহাদের সমাজে প্রচলিত অনুকূল বিধান সত্ত্বেও আর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে নাই। ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঝি-গিরি করিয়া ফিঙেকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। দশ এগার বৎসর বয়স হইতেই ফিঙেও মায়ের মনিবের বাড়ীতে গরুর রাখালের কাজ করিতেছে। এখন সে আর গরুর রাখাল নয়—ষোল সতের বৎসর বয়সে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে মাহিন্দারের পদে উপনীত হইয়াছে; অর্থাৎ গোচারণের পরিবর্ত্তে গরুর তদ্বির তদারক এবং মনিববাড়ীর কাঠ-চেলানো—গাড়ী লইয়া যাওয়া, দুই চারিটা ডাক হাঁক

প্রভৃতি কাজ করিবার অধিকার পাইয়াছে! কিন্তু এ তাহার বেশ ভাল লাগে না। তাহার জ্ঞাতি গোষ্ঠী যখন কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে উঠিয়া বাড়ী হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যায় তখন তাহার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধক্-ধক্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করে, সে অকারণে তাহার মায়ের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, কারণ বার বার বাধা দেয় তাহার মা। ফিঙের মা সত্যই বাধা দেয়, ফিঙে বড় দুর্ব্বল—ষোল সতের বৎসর বয়স হইলেও ফিঙেকে দেখিয়া মনে হয় তের চৌদ্দ বৎসরের বালক। এ প্রস্তাব উঠিলেই ফিঙের মা কাঁদে, বলে,—ওরে জেল হলে তু আর বাঁচবি না রে! তোকে ঠিক ধ'রে ফেলাবে।

ফিঙে তর্জ্জন করিতে থাকে, মাকে গালিগালাজ করিয়া বলে—না বাঁচবে না! হারামজাদী—জেল থেকে ফিরে এসে হাবলদাদার গতর কেমন হয়েছিল, দেখেছিলি! কাকার গতর দেখেছিলি!

সত্য! যাহারা জেলে যায়—তাহারা ফেরে সবলতর দৃঢ়তর দেহ লইয়া, নিজেরাই রসিকতা করিয়া বলে—জেলের ভাতের গুণ কি, আর মিষ্টি কি! তারপর গম্ভীর ভাবেই বলে—জিনিষ সব খাঁটি কিনা, ত্যাল সে তোমার ঝাড়া সরষে, ময়দা সে একেবারে ঝরঝরে গম, ইয়া মোটা মোটা ছোলা, লাল সেরাক্ মুশুরি!

হাবল গল্প করিয়াছে বিড়ি গাঁজা সব মেলে, মেলে না কেবল মদ।

ফিঙে আরও উত্তেজিত হইয়া মাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, ফিঙের মা শুধু অঝোরঝরে কাঁদে। কান্নাটা উহার চোখের ডগায় যেন লাগিয়া থাকে। আজও ফিঙের মা কাঁদিল। কিন্তু ফিঙে আজ দৃঢ়সংকল্প, সে সেসব গ্রাহ্যই করিল না। আপন সঞ্চিত অর্থ হইতে দেড়টি টাকা লইয়া বিপুল উৎসাহের সহিত পাঁঠা কিনিতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হইতেই সদলে শশী মদ লইয়া বসিয়াছিল। ফিঙেও বসিয়াছে, সে-ই তো আজ নায়ক। আজ সে অকারণে হা-হা করিয়া হাসিতেছে, অশ্লীল

গান করিতেছে—তাহার মনের উত্তেজনা আনন্দ যেন তুবড়ীর আলোক স্ফুলিঙ্গের মত ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে।

ফিঙের মা নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ছিল, সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে।

শশী বলিল—বউ, তুই ভাবিস না, ফিঙে আমাদের ভারি টাটোয়ার হইছে। কেউ ওকে ধরতে লারবে।

ফিঙে পরম আনন্দে গান ধরিল—'সুড়ৎ করে পালিয়ে যাব গিরগিটীর মতন'।

ফিঙের মা জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল।

আষাঢ় মাস, অমাবস্যার রাত্রি; আকাশে ঘনঘটা মেঘ ছিল না, কিন্তু পাতলা একটা মেঘের আবরণের মধ্যে আকাশের তারাগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিশাচরের দল দ্রুত নিঃশব্দে চলিয়াছে, কাহারও মুখে কথা নাই। ফিঙে কেবল শব্দ শুনিতে পাইতেছে, কি যেন একটা ধক্ ধক্ করিয়া তাহারই বুকের মধ্যে চলিতেছে।

কৃপণ ফ্যালারাম চৌধুরীর প্রচুর ধান। কিন্তু যেমন কুৎসিত বনমানুষের মত চেহারা—লোকটাও তেমনি বর্ব্বর। ফিঙে তাহাকে দেখিয়াছে; দিনেও লোকটাকে দেখিয়া ভয় হয়। ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল; অবিরাম একটা কম্পন ট্রেণের কম্পনের মত বহিয়া যাইতেছিল। শশী হাবলকে কাঁধে করিয়া প্রাচীরের উপর তুলিয়া দিল। হাবল প্রাচীরের উপর বসিয়াই বলিয়া উঠিল 'লোক'! সঙ্গে সঙ্গে সে ঝপ করিয়া লাফ দিয়া পড়িল, বলিল,—পালাও।

সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীবাড়ীর বাহিরে আশপাশ হইতে দশ পনের জন লোক ছুটিয়া আসিল। মূহূর্ত্তে নিশাচরের দলও ছুটিল। যেন মায়াবীর মতই অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। ফিঙেও ছুটিয়াছিল, কিন্তু দলের কে কোন দিকে যে গেল—সে ঠাওর করিতে পারিল না। দুর্দান্ত ভয়ে সে গাছের পাতার মত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! কোন্ দিকে যে সে চলিয়াছে

তাহার ঠাওর ছিল না। অকস্মাৎ পায়ে একটা কি জড়াইয়া গেল। সাপ! সে ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করিয়া সেইখানেই উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। না, সাপ না, সাপ ন, একটা লতা পায়ে বাধিয়া গিয়াছে। উঃ লতাটার সর্ব্বাঙ্গে কি কাঁটা! পা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে।

'এইখানেই—এইখানেই আছে। এইখান থেকেই শব্দ উঠছে।'

ভয়ের উত্তেজনায় ফিঙের সর্ব্বশরীরে রক্ত দ্রুততর গতিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। বন্দুকের গুলিতে মাথা উড়িয়া যাওয়ায় পাখী যে গতিবেগে সিকি মাইলের উপর উড়িয়া গিয়া পড়ে সেই উত্তেজনায় সেই গতিবেগে ফিঙে আবার ছুটিল। জঙ্গল ঠেলিয়া বাহির হইতেই দশ বারো জনে চীৎকার করিয়া উঠিল।

—ওই—ওই। ওই পালাল শালা।

দৌড়, দৌড়। ফিঙে ছুটিয়াছে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া। এ কি? সে কোথায় আসিয়া পড়িল। পুকুর—সামনে যে একটা পুকুর। মুহূর্ত্তে ফিঙে পুকুরে নামিয়াই পড়িল। আকণ্ঠ ডুবিয়া পানা ও শালুকের দামের মধ্যে মথাটা জাগাইয়া বসিয়া রহিল। আঃ শরীরটা ঠাণ্ডা জলে যেন জুড়াইয়া গেল।

পিছনে পিছনে অনুসরণকারী দল আসিয়া পুকুর পাড়ে দাঁড়াইয়া বলিল —কোন দিকে গেল? ফিঙে আর সাহস করিয়া জলের উপর মাথা জাগাইয়া থাকিতে পারিল না, বুক ভরিয়া একটা নিশ্বাস লইয়া ডুব দিল। কিন্তু ভয় ও উত্তেজনার মুখে নিঃশব্দে ডুবিতে পারিল না, জল আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—ওই—ওই শালা জলে ডুবেছে! আলো—আলো! আলো আসিল।

জলের ভিতরে রুদ্ধশ্বাসে ফুসফুস যেন ফাটিয়া যাইতেছে। ফিঙে ভাসিয়া উঠিল উন্মত্তের মত; সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পড়িল একটা লাঠি। চারিদিকে উন্মত্ত জনতার উত্তেজিত কোলাহল—ওই—ওই!

—লাগাও লাঠি।

—মার শালাকে জলে ডুবিয়ে!

—ওই—ডুবেছে শালা!

—হুই—ভেসে উঠেছে মাঝ জলে।

সঙ্গে সঙ্গে দু' তিনজন জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জনতার একাংশ ভাঙিয়া ও' পারের দিকে ছুটিয়া গেল। কতকগুলি ছোট ছেলেও আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে, তাহারা হাততালি দিয়া নাচিতেছে, আর প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে—ওই—ওই। হুই—ও!

ফিঙে আবার ডুবিল, তাহার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা—সে আর পারিতেছে না; এ দিকে, পিছনে সাঁতার দিয়া উহারা আসিয়া পড়িয়াছে।

কৌতুক ভরে একজন বলিল—ডুবেছে রে শালা—ফের ডুবেছে।

—হুই উঠেছে!—পাড়ের ধারে ধারে। হুই!

গ্রামের দুষ্ট কুকুরকে দল বাঁধিয়া ঘিরিয়া মারিয়া ফেলিবার সময় যেমন একটা দর্পিত শিকারের আনন্দ মানুষকে শক্তির উচ্ছ্বাসে পাগল করিয়া তোলে, তেমনি ভাবেই জনতা পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। ফিঙে মাথা তুলিতেই একজন সতর্কিত লক্ষ্যে বসাইয়া দিল তাহার লাঠি। ফিঙে এবার আর ইচ্ছা করিয়া ডুবিল না, আপনি ডুবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহাকে ধরিল—শালা—আবার ডুববে মনে করেছ?

কলরব—কোলাহলে নিস্তব্ধ রাত্রির পৃথিবী মুখর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। চোর!—চোর!—চোর ধরা পড়িয়াছে!

—মার—শালাকে মার! কিল চড়, লাথি, বেত, লাঠি; লাগাও শালাকে। বল্ শালা—আর কে কে ছিল?

ফিঙে নীরব। অদ্ভুত অবস্থা তাহার, প্রহারে আর যেন বেদনা বোধ হইতেছে না। এতগুলা লোক সব যেন তাহার চারিদিকে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। ইঃ, মানুষের মুখগুলো কেমন লম্বা হইয়া যাইতেছে!

একটি মুখ শুধু অবিকৃত, সে তাহার মায়ের মুখ। হারামজাদী বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে!

—এই আর মারিস না, মরে যাবে! এই-এই!

জনতার কৌতুক অবসন্ন হইয়া স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। একজন বলিল, নে এইবার তামাক সাজ দেখি একবার।

একদল ছোট ছেলে, যাহারা এতক্ষণ মদের নেশার উত্তেজনার মত উত্তেজনায় হাততালি দিয়া চীৎকার করিয়া সে উত্তেজনাকে ক্ষয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহারা এইবার ফাঁক পাইয়া আসিয়া ফিঙের অসাড় দেহের উপর লাথি মারিতে আরম্ভ করিল—শালা!

বয়স্কদের স্তিমিত উত্তেজনাও মুহূর্ত্তে আবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহাদের একজন হাসিয়া বলিল—মার শালার মুখে লাথি! মার!

যাহারা প্রথম হইতেই চোর ধরার বীরত্বে লিপ্ত ছিল—তাহাদের উত্তেজনা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। একজন আরম্ভ করিল—সব শালা দুড় দুড় করে ছুটে পালাল। আমি গোড়া থেকে এই বেটার পিছু নিয়েছিলাম।

একটা কঠিন আক্ষেপে ফিঙে মুখ বিকৃত করিতেছিল, কিন্তু যন্ত্রণা আর তাহার নাই, সব ঘোলা হইয়া আসিতেছে। শুধু কালো কুয়াসার মধ্যে একটা যেন আলো জ্বলিতেছে।—না—আলো নয়, ওটা তাহার মায়ের মুখ। হারামজাদী কাঁদিতেছে!

হাসপাতালে গিয়া ফিঙে মরিল।

চোরের মায়ের প্রকাশ্যে কাঁদিবার উপায় নাই বলিয়া একটি কথা আছে। কিন্তু সেটা ছেলে ধরা পড়িবার ভয়ে নিরুদ্দেশ হইলে বা ছেলে ধরা পড়িয়া জেলে গেলে। মরিলে কাঁদিবার বাধা নাই, কিন্তু ফিঙের মা কাঁদিল না, প্রকাশ্যেও না গোপনেও না। সে কাঁদিতে পারিল না। সে যেন হতভম্বের মত হইয়া গেল। যেমন কাজকর্ম্ম করিয়া খাইত তেমনই করিয়া যায়। আপনার অবস্থাটা সে যেন সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। ফিঙে

মরিয়াছে! হ্যাঁ—কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর যে কম্পনে উত্তেজনায় বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ আবেগ জাগিয়া উঠিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দেয়, চোখে জল আসে, বুক ফাটাইয়া চীৎকার করিবার একটা সহজাত প্রেরণা জাগিয়া উঠে, সেই স্নায়ুমণ্ডলী তাহার যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে।

ফিঙের কথা কেহ বলিলে সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার আর একটা বাতিক হইয়াছে; কাহারও ছেলে মরিলে ফিঙের মা সেখানে ছুটিয়া যাইবেই। সেখানে গিয়া সে উবু হইয়া একধারে বসিয়া সমস্ত দেখে। মায়ের কান্না দেখে, বুক চাপড়ানো দেখে, আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। অবশেষে মনিব বাড়ীর কাজের সময় হইলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলে,—যাই মা, মনিবে তো সুখ দুখ মানবে না। কিন্তু কান্না তাহার আসে না।

বৎসর খানেক পর।

মনিববাড়ীর কাজ সারিয়া ফিরিতেই শশী আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ভগবান আছে বই কি, শালা চৌধুরীর বেটা মরেছে, দশ বছরের বেটা!

ফিঙের মা কিছুক্ষণ শশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সে চলিল চৌধুরীর বাড়ীর দিকে। বাড়ীখানা লোকে ভরিয়া গিয়াছে। ফিঙের মা পাশে পাশে গিয়া বারান্দায় শায়িত শবদেহের অল্পদূরেই উবু হইয়া গালে হাত দিয়া বসিল। চৌধুরীর স্ত্রী ছেলের বুকের উপর পড়িয়া আছে—অসাড় নিস্পন্দ আর একটি শবদেহের মত!

সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ফিঙের মায়ের চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল। আঃ, হায়-হায়, কি দুঃখ ওই মেয়েটির, কি মর্ম্মান্তিক দুঃখ। ফিঙের মায়ের বুকের ভিতর একটা বিদ্যুতের মত শিখা এ প্রান্ত হইতে ও' প্রান্ত পর্য্যন্ত খেলিয়া গিয়া সব যেন পোড়াইয়া দিল। তাহার অসাড় স্নায়ুতে যেন নূতন চেতনা জাগিয়া উঠিল। ওই মেয়েটির প্রতি করুণায় তাহার বুক যেন

ফাটিয়া গেল। সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ঝরিয়া তাহার বুক মুখ ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতেই অকস্মাৎ সে উঠিয়া একরূপ ছুটিয়াই পলাইয়া গেল। আপন বাড়ীতে নয়, একেবারে গ্রাম ছাড়িয়া নির্জন প্রান্তরে আসিয়া বুক ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওরে বাবা আমার, ও মাণিক রে!

কিঙের জন্য নয়—ওই চৌধুরীর ছেলেটির জন্যই সে কাঁদিতেছিল। তাহার মধ্যে এতটুকু ছলনা ছিল না। হায়—ওই মা'টির কি বুক পাষাণ-করা দুঃখ।

চোর

রাত্রির প্রথম প্রহরেই চুরি। 'ভাত-ঘুম' বলিয়া পল্লীগ্রামে একটা কথা প্রচলিত আছে; ভাতই হউক আর রুটিই হউক আর মুড়িই হউক—আহার্য্যদ্রব্যে উদর পূর্ণ হইলেই বেশ একটা নেশার আমেজ জমিয়া আসে; ভোরের ঘুমের মতই সে ঘুম উপভোগ্য। পল্লীবাসীরা সেই ঘুমে আচ্ছন্ন হইলেই চুরি হইয়া যায়। উপর্য্যুপরি দশ-দশটা চুরি হইয়া গেল। পল্লীর অধিবাসীবৃন্দ হইতে পুলিশ পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল।

চোর যে একজন অথবা একই দল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সব ক্ষেত্রেই চুরি যায় বাসন, তাও ঘটিবাটি নয়, কেবল থালা, দামী কাপড়চোপড় তো সব বাড়ীতেই ছিল—সে সবে চোর কোন ক্ষেত্রেই হাত দেয় নাই। কোন ক্ষেত্রেই বাড়ীর দুয়ার খুলিয়া বাহিরে যায় নাই, বাড়ীর দুয়ার যেমন বন্ধ—তেমনি বন্ধ থাকে, চোর পাঁচিল টপকাইয়া যায় আসে।

থানার দারোগা রামশরণ সিংহের যেমন একজোড়া প্রচণ্ড এবং প্রকাণ্ড বড় গোঁফ—তেমনি তিনি রসিক ব্যক্তি!—স্বীকারোক্তির জন্য আসামীর হাতের নখে আলপিন ফুটাইতে ফুটাইতে তিনি গান করিয়া থাকেন—

"পিরীতির বাবলা কাঁটা
বিঁধল পাঁজরে।
সখি লো—ব'লো নাগরে।"

সেই রামশরণ সিংহ দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন—চোরের নাম তো পেলাম, এখন ঠিকানাটা পেলে হয় যে!

লোকজনে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল; শার্লক হোমসের মত রামশরণ গম্ভীরভাবে বলিলেন—বেটার নাম টপকেশ্বর।

নাম ঠিক হইলেও ঠিকানা মিলিল না, দারোগা সাহেব এ চাকলার দাগীগুলার বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তচনচ করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু কোনটিই টপকেশ্বরের গুহা বলিয়া নির্ণীত হইল না। অবশেষে তিনি চৌকিদারদের প্রহার দিতে আরম্ভ করিলেন এবং গ্রামের বেকার যুবক সম্প্রদায়কে ডাকিয়া 'ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি' গঠন করিয়া জোর পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। তাহাতে ফল কিছু হইল, একটা মেছো মাছ চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল, গ্রামের সুপ্রসিদ্ধা কোন্দলকারিণী জাঁহাবাজ সুরভি ঠাকরুণ প্রতিবেশীর দরজায় ময়লা লেপিতে লেপিতে ধরা পড়িয়া গালিগালাজে নিশীথরাত্রি কদর্য্য করিয়া তুলিল। আরও অনেক কিছু হইল—কাহারা বাবুদের কাঁচামিঠে আমের গাছটা একেবারে ফাঁক করিয়া দিল, পানসিগারেট্‌ওয়ালা ফটিক দাসের দোকান হইতে পঞ্চাশ প্যাকেট সিগারেট পূর্ণ দুইটা বাক্স চুরি গেল, গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় গোয়ালের গরুগুলি গোয়াল হইতে বাহির হইয়া স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া ফিরিল, কিন্তু টপকেশ্বর ধরা পড়িল না, অথচ চুরিও বন্ধ হইল না। দশদিন, বিশদিন, কখনও একমাস, কখনও বা দুইমাস অন্তর এক একটা চুরি হইয়া চলিল। মোটকথা—'এই চুরি হইয়া গেল, এখন আর চুরি হইবে না' কিম্বা 'অনেক দিন হইয়া গেল—চোর এবার ভয় পাইয়াছে'—যে কোন ধারণায় মানুষ নিশ্চিন্ত হইলেই একদিন চুরি হইয়া যায়।

উপরওয়ালার গুঁতো খাইয়া রামশরণ দারোগার রসিকতা মাত্রাতিরিক্ত রূপে বাড়িয়া গেল ; কথা কহিতে গেলেই লোকের সঙ্গে তিনি সহধর্ম্মিণীর সহোদর সম্বন্ধ পাতাইতে আরম্ভ করিলেন ; একজন চৌকিদারের নাকে গাড়ুর নল পুরিয়া নাসিকাগর্জ্জনের ঔষধ বাতলাইয়া দিলেন, এমন কি এই বয়সে পত্নীর সহোদরাকে বিবাহ করিবার আজীবনপোষিত সংকল্প স্ত্রীর সম্মুখেই প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন—স্ত্রীকে বলিলেন—শ্যালিকা !

ডিফেন্স পার্টি অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দিলেন। অহরহ চিন্তায় চিন্তায় তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন।

এ গ্রামে চোর আছে পাকাচোর, বংশানুক্রমিক চোরের বংশ। তিন পুরুষ ধরিয়া তাহাদের রক্তে চৌর্য্যব্যাধির বীজাণু কিলবিল করিতেছে ; সরকারী জেলখানার দেওয়ালে পেরেক খোদাই দাগে—বাগানে রোপিত গাছের মধ্যে এ গ্রামের ডোমবংশের ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিক গৌরবে লিখিত আছে। কিন্তু বনিয়াদী বংশের মত তাহাদের ধারা-ধরণ তিনপুরুষ ধরিয়া একই চালে চলিয়াছে। তিন পুরুষ ধরিয়া তাহারা ধান-চোর। ধান চুরি করিতে আসিয়া হাতের কাছে অধিকতর মূল্যের জিনিষ পড়িয়া থাকিলেও তাহারা তাহাতে হাত দেয় না। এ গ্রামের লোক আজ তিন পুরুষ ধরিয়া ধানের গোলাতেই মোটা এবং শক্ত তালা দিয়াছে, কিন্তু সিন্দুকের ভাবনা কোন দিন ভাবে না। তা ছাড়াও, ডোমবংশের কীর্ত্তি অব্যাহত রাখিতে পুলিশ এক শশী ছাড়া কাহাকেও বাহিরে রাখে নাই। বি-এল কেসে আঠারো বছর হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত সকল ডোমেরই দীর্ঘ কারাবাসের ব্যবস্থা হইয়া গেছে। একটা ছেলেকে তো ঠ্যাঙাইয়াই মারিয়া ফেলিয়াছে কুকুরের মত। এক আছে শশী—শশী অবশ্য এক কালের সিংহ—আফ্রিকার চতুর নরখাদক সিংহ, কিন্তু এখন সে স্থবির, বাতে প্রায় পঙ্গু। এক বৎসরের ও ঊর্দ্ধকাল শশী এখন লাঠি ধরিয়া কোন মতে চলা-ফেরা করে। তাহার পূর্ব্বে মাস-ছয়েক শয্যাশায়ী হইয়াই ছিল। বসিয়া বসিয়া বসিয়া বাঁশ-তালপাতায়

আপনাদের কাজ করিয়া এখন কায়-ক্লেশে বাঁচিয়া আছে। লোকটার যথেষ্ট পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। এই চুরির প্রথম ঝোঁকে ডোম পাড়া খানাতল্লাস করিতে গিয়া দারোগা স্বচক্ষে তাহার অবস্থাও দেখিয়া আসিয়াছেন, শরীরের হাড়-পাঁজরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শশী একটা লাঠি পাশে রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া উবু হইয়া বসিয়া ছিল—তাঁহাকে দেখিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া নমস্কার করিয়াছিল।

একজন কনেষ্টবল ঘরের ভিতর হইতে জিনিষপত্র বাহির করিতেছিল, জিনিষের মধ্যে রাজ্যের ডালা-কুলা। তিনি দাঁড়াইয়া শশীর দিকেই চাহিয়া ছিলেন, লোকটার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দুঃখ হইতেছিল। শশী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল—শেষকালটায় বড় দুঃখ পেলাম হুজুর। আর বাঁচব না।

রামশরণ সান্ত্বনা দিয়াছিলেন—তুই তো বড় পাজী রে বেটা শশে! তোর বাতব্যাধি আমাদের দিয়ে যাবার মতলব করছিস যে! এ্যাঁ? তুই বেটা ম'লে তো গোটা থানারই বাত ধ'রে যাবে রে ব'সে ব'সে!

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাটা সমঝাইয়া শশী ফিক্ করিয়া খানিকটা হাসিয়া বলিয়াছিল—লোক তো এসেছে হুজুর।

রামশরণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—তোর মাসতুত ভাইয়ের নামটা কি বল দেখি শশী? আমি তোকে পঞ্চাশ টাকা বকশিস দেওয়াব সরকার থেকে। মাসতুত ভাই বলিতেই শশী আবার হাসিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—জানিনা হুজুর, বাতে ভুগছি—পক্ষাঘাত হবে মিছে বলি তো।

দারোগা তাহার মুখ চোখের দিকে চাহিয়া বুঝিয়াছিলেন—শশী মিথ্যা বলে নাই। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—শালা বড় জ্বালাতন করছে শশে। শালার টিকি দেখতে পেলাম না রে একদিন।

শশী মাসতুত ভ্রাতাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে শ্যালক সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল

—শালার কিন্তু ভারী বুদ্ধি হুজুর। আমাদের মতন ধানছড়া দিয়েও যায় না; দুম'ণে বস্তাও শালাকে বইতে হয় না।

রামশরণ চিন্তা করিতে করিতেও শিহরিয়া উঠেন, উঃ শশী যদি ধান চুরি না করিয়া অন্য চুরিতে হাত দিত তবে কি আর রক্ষা ছিল! এমন সুগঠিত দেহ—একেবারে তাজা কেউটে সাপের মত চেহারা—মিশ্‌কাল—ছিপ্‌ছিপে লম্বা! এককালে বেটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া ছুটিত। দেড়মণ ধান বোঝাই বস্তা লইয়াও শশী ছুটিলে পিছন হইতে কেহ কখনও তাহার গায়ে হাত দিতে পারে নাই। আজও পর্য্যন্ত শশী কখন ধরা পড়ে নাই। শশীকে ধরিতে হইয়াছে তাহার বাড়ীতে আসিয়া। বেটা কেউটে যদি গর্ত্তে মুখ ঢুকাইত—অর্থাৎ সিঁদ দিতে শিখিত, তাহা হইলে সর্বনাশ করিয়া ছাড়িত। সিঁদ দিবার মত এমন উপোযোগী দেহ আর হয় না! কিন্তু ভগবান তাহাকে মারিয়াছেন। সাপটা মরিয়া গেছে—যেটা আছে সেটা তাহার খোলস।

রামশরণ ভাবিয়া কিনারা পান না। চোর নূতন তাহাতে সন্দেহ নাই, নূতন কিন্তু পাকা। তিনি স্থানীয় বাজারটার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন এবং রাত্রে সরীসৃপের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে সমস্ত রাত্রি সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। নগদ আট টাকা খরচ করিয়া ভদ্রলোক একেবারে প্রথম শ্রেণীর ক্রেপসোল জুতা কিনিলেন।

একদিন দেখা মিলিল।

রামশরণ সরীসৃপের মত তাহাকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিলেন—কিন্তু চোর যেন পাঁকাল মাছ, সে তাঁহার পাকের কবল হইতে পিছলাইয়া বাহির হইয়া গেল।

নাপিতপাড়ার সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে নিতান্তই অকস্মাৎ নাপিতদের পাঁচিল হইতে একেবারে সম্মুখেই টপকেশ্বর ধপ করিয়া লাফাইয়া পড়িল। রামশরণ লোকটাকে জাপটাইয়া ধরিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য চতুর চোর, সে মুহূর্ত্তে বসিয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তে হনুমানের

মতই বসিয়া বসিয়া একটা লাফ দিয়া—স্প্রিংয়ের পুতুলের মত উঠিয়া পালাইয়া গেল। সে ছোটা যেমন তেমন ছোটা নয়—জ্যা-বিমুক্ত তীরের মত তাহার গতি। রামশরণ পিছন ফিরিয়া চৌকিদারটার গালে একটা বিরাশী সিক্কার চড় বসাইয়া দিলেন—শালা, তুই করছিলি কি? লাঠি চালাতে পারলি না?

কৈফিয়ৎ ছিল; কিন্তু চৌকিদারটা দিতে সাহস করিল না; সঙ্কীর্ণ গালি, দারোগাবাবুর শরীর বিপুল—পাশ কাটাইয়া যাইবার পথ ছিল না। পিছন হইতে লাঠি মারিলে—

রামশরণ এতক্ষণে টর্চ্চ জ্বালিলেন—টর্চ্চের আলোয় বাঁ হাতটা একবার দেখিলেন—হাতখানা একবার চোরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল—এবং হাতে একটা চট্‌চটে কিছু যেন তিনি অনুভব করিতেছিলেন। দেখিলেন—হাতময় তেল লাগিয়া গিয়াছে। তিনি আজ নিঃসন্দেহ হইলেন—টপকেশ্বর বিদেশ হইতে ছট্‌কাইয়া আসিয়াছে। লোকটা সিঁদেল চোর, দেহ তৈলাক্ত করিয়া যাওয়ার পদ্ধতিটাই সিঁদেল চোরের; সিঁদের মধ্যে পা পুরিলে কেহ যদি পা চাপিয়া ধরে তবে টানিয়া লইবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা সদুপায় আর কিছু হইতে পারে না। আরও বুঝিলেন—সঙ্গের অভাবেই সহধর্ম্মিণীর সহোদর সিঁদ না দিয়া বাসন চুরি করিয়া ফিরিতেছে। গোল লাগিল এক জায়গায়, সাপ বাঘের শক্তি পাইল কি করিয়া? সিঁদেল চোরের বিবর লইয়া কারবার—সে এমন লাফ দেয় কেমন করিয়া?

ইহার পরদিন হইতে চুরি বন্ধ হইয়া গেল। পুরা একমাস বন্ধ থাকিয়া আবার একদিন চুরি হইল; এবার চুরি ভোর রাত্রে। শম্ভু ঘোষ হলপ করিয়া বলিল—রাত্রি তিনটার সময় সে বাহিরে উঠিয়াছিল, তখনও রান্নাঘরের তালা অটুট ছিল।

কটমট শব্দে রামশরণ দাঁতে দাঁত ঘসিয়া বলিলেন—রাত্রি তিনটে! ওরে, শেয়াল ক'বার ডেকেছিল?

শম্ভু হাঁ করিয়া রহিল।

রামশরণ বলিলেন—রাত্রি ক'পহর হয়েছিল রে বেটা তাই বল্। শেয়াল ডাকা না শুনে থাকিস, ভুক্কো তারা উঠেছিল কি না বল্। রাত্রি তিনটে! রাত্রি তিনটে! বেটার চালে যেন টাওয়ার ক্লক বাজে! রাত্রি তিনটে!

শম্ভু সবিনয়ে বলিল—আজ্ঞে আমার ঘড়ি আছে।

রামশরণ অপ্রস্তুত হইয়া আরও চটিয়া উঠিলেন—বলিলেন—বাজে? না, বাজে না?

—বাজে। আমি ফিরে এসে শুলাম আর তিনটে বাজল।

—হুঁ! আচ্ছা যা, বাড়ী যা।

ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে বিপরীতমুখী হইল। দারোগা রামশরণ আবার ডাকিলেন—শোন্।

—বাড়ীতে কলাগাছ আছে?

—আজ্ঞে আছে।

—তবে বাসনগুলো সিন্দুকে পুরে, কলাপাতা কেটে ভাত খাবি। আর জল খাবি নারিকেল মালায়—বুঝলি?

ঘোষ সবিনয়ে 'যথা আজ্ঞা' জানাইয়া প্রস্থান করিল। ক্রোধে লজ্জায় ক্ষোভে রামশরণের চোখে জল আসিল। সাঁতরাগাছির ওলের মত পুলিশ-সাহেবের চাঁচাছোলা রক্তরাঙা মুখখানি মনে পড়িয়া মনে হইল—মাথায় একটা লোহার ডাণ্ডস মারিয়া সে আত্মহত্যা করে!

দশদিন চোরের, একদিন সাধুর—এ-কথাটার আধ্যাত্মিক সত্যতা অস্বীকার করিয়াও বৈজ্ঞানিক সত্যতা না মানিয়া উপায় নাই। বিবরে বাস করিয়া, জনহীন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যে সাপ ঘোরে সেই সাপও একদিন মানুষের সম্মুখে পড়িয়া যায়।

চোরকেও একদিন গৃহস্থের সম্মুখে পড়িতে হইল।

কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর কাস্তের মত চাঁদ সবে পূর্ব্বদিগন্তে উঠিয়াছে, দিগন্ত-প্রান্তের শারদ জ্যোৎস্না নির্ম্মল আকাশপটের প্রতিফলনে অন্ধকারকে অতিমাত্রায় স্বচ্ছ

তরল করিয়া তুলিয়াছিল। অমৃত ঘোষাল দরজা খুলিয়া বাহির হইয়াই দেখিল—একটা লোক বসিয়া গামছায় বাসন বাঁধিতেছে। ঘোষাল লোকটা গোঁয়ার এবং বুদ্ধিমান দুই-ই। একবার ভাবিল ঝাঁপ দিয়া লোকটার উপরে লাফাইয়া পড়ে, পরক্ষণেই মনে হইল যদি লোকটার কাছে অস্ত্র শস্ত্র কিছু থাকে। দ্বন্দ্বটা মুহূর্ত্তের, কিন্তু সেই অবকাশেই টপকেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। পর মুহূর্ত্তেই ছুটিয়া গিয়া পাঁচিলের উপর একটা হাত দিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে পাঁচিলের উপরে উঠিয়া বসিল; তাহার পর আর নাই।

ঘোষাল 'চোর-চোর' চীৎকার করিতে করিতে দরজা খুলিয়া ছুটিল। চোরকে সে চিনিয়াছে। চোর শশী! শ'শে ডোম! শ'শে চোর!

শশী বাড়ীতে আসিয়া দেখিল ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু শিকলটা মৃদু মৃদু দুলিতেছে। ঘোষাল কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিল. দরজায় লাথির উপর লাথি মারিয়া সে ডাকিল—হারামজাদা শালা!

নামটা পর্য্যন্ত সে তখন ভুলিয়া গিয়াছে।

শশী ঘরের মধ্যে রোগযন্ত্রণায় কাতরাইতেছিল। সবিনয়ে সকাতরে সে উত্তর দিল—আজ্ঞে—কে মশায়?

ঘোষালকে আর পরিচয় মুখে দিতে হইল না, এবারকার প্রচণ্ড পদাঘাতে জীর্ণ কুটিরের দরজার খিল ভাঙিয়া দরজাটা খুলিয়া গেল—ঘোষাল শশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—আমি।

খোলস নয়, কালোসাপ ফণা তুলিয়া বিবর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সক্ষম শশী একেবারে ঘোষালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কি?

খপ করিয়া শশীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া ঘোষাল অপর হাতটা তাহার বুকের উপর রাখিল। ঘোষালের হাতে কি লাগিয়া গেল—কিন্তু সে অনুভব করিল—শশীর বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারিতেছে। ঘোষাল বলিল—শালা চোর!

শশী বলিল—ঠাকুর, বাড়ী যাও, তোমার বাড়ীতে আর চুরি হবেনা। আমি দিব্যি করছি।

একটু দূরে লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল, ঘোষালের ডাকে লোক উঠিয়া এই দিকেই আসিতেছে। রামশরণ দারোগার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শোনা গেল—ওরে শালা গায়ে কাদা মেখে যমকে ফাঁকি দেবার মতলব! শালার বুকে চ'ড়ে আজ হাঁটব আমি, কাদা বানাব শালাকে। কীচকবধ করব আজ!

সাহস পাইয়া অমৃত এবার শিখণ্ডী বিক্রমে আস্ফালন করিয়া উঠিল—একটা অতি অশ্লীল গাল দিয়া—কি বলিতে গেল; কিন্তু গালটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র সজোর আকর্ষণে হাতখানাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শশী মুহূর্ত্তে একটা প্রচণ্ড চড় কষিয়া দিল। ঘোষাল প্রাণপণে আত্মসম্বরন করিবার চেষ্টা করিল; চোখের সম্মুখে ছায়াবাজির মত কাল দীর্ঘ কি-একটা ধূসর আবছায়ার মধ্যে মিলাইয়া গেল, কানে আসিল লঘু দ্রুত একটা ক্রমবিলীয়মান শব্দ।

লোকজন এবং দারোগা যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন অমৃত আত্মস্থ হইয়াছে, কিন্তু শশী নাই।

রামশরণের তাণ্ডবনৃত্য করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া কয়জন চৌকিদার, দফাদার ও কনষ্টেবলকে ছুটাইয়া দিলেন! জনতার সকলেই প্রায় শেষরাত্রির রহস্যঘন আবছায়ার দিকে চাহিয়া শশীকে লক্ষ্য করিতেছিল। প্রত্যেকেরই চোখের সম্মুখে আবছায়া যেখানে ঘন হইয়া উঠিয়াছে সেইখানে দীর্ঘ কালো একটি মূর্ত্তি যেন নাচিতেছিল! সকলেই বলে—ওই! নয়?

রামশরণ সহসা গম্ভীর মুখে অমৃতের কাছে আসিয়া বলিল—এই বেটা বাম্‌না—ঘরের দরজা ভেঙ্গে পালোয়ানী করতে গেলি কেন? শেকল দিলি না কেন?

ঘোষাল একটু ভয় পাইয়া গেল, সে গালে হাত বুলাইয়া বলিল—আমার দুর্ম্মতি ছাড়া কি বলব, বলুন?

—হুঁ। কোন্ গালে চড় মেরেছে দেখি?

ঘোষাল লজ্জিতভাবেই দেখাইল—বাম গালটি দারোগার দিকে ফিরাইয়া বলিল—বেকায়দায়—আর আমি বুঝতে পারি নাই ঠিক।

রামশরণ টর্চ্চ জ্বালিলেন—দেখিলেন পাঁচটি সোঁটা-সোঁটা দাগ একেবারে রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দর্শকদের সকলেই বলিয়া উঠিল—এঃ!

একজন বলিল—সাঙ্ঘাতিক চড় মেরেছে রে বাবা!

রামশরণ অত্যন্ত খুশী হইলেন—ঘোষালের মুখের কাছে অত্যন্ত বিনয়-সহকারে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—বে—শ করেছে! তাঁহার ইচ্ছা ছিল—শশী এক চড় মারিয়া গিয়াছে বাম গালে--তিনিও একখানি চড় কষিয়া দেন উহার ডান গালে। কিন্তু আইন বড় কড়া।

হাতের মাছ জলে চলিয়া গেল, হাতের আসামীকে ফেরার করিয়া দিল! শশী সত্য সত্যই ফেরার হইল।

কিন্তু জীর্ণ শশী এই রোমাঞ্চকর চৌর্য্যপর্ব্বের ক্ষিপ্র সুকৌশলী নায়ক, বাতরোগে পঙ্গুপ্রায় শশীই সেই টপকেশ্বর, এ কথা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। গ্রামের লোক বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। রামশরণ বলিলেন—হারামজাদা বেটার রক্তের দোষ, নইলে চুরি করিতে গেল কেন? যাত্রা থিয়েটারে এ্যাক্টো করলে ও বেটার ভাত খায় কে? উঃ কি রকম বেতো-রোগী সেজে ব'সে থাকত বল দেখি। আগাগোড়া বেটার বজ্জাতি!

রামশরণের খানিকটা ভুল হইল, 'আগা' অর্থাৎ শেষের দিকটা বজ্জাতি—কিন্তু গোড়াটা নয়। গোড়ায় তাহার সত্যই রোগ হইয়াছিল, সে-রোগ যেমন-তেমন নয়, তাহাকে একেবারে পঙ্গু শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছিল। আর সে কি তীক্ষ্ণ প্রাণান্তকর যন্ত্রণা। শশীর ছেলে হাবল তখন বাড়ীতে। রোগের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শশী নিজেই ছিল ডোমদলের সিংহ; তখন তাহার বাড়ীতে চালচলন প্রায় সামন্ততান্ত্রিক আমলের ছোটখাট বর্ব্বর সামন্তপতির মত! স্ত্রী ছাড়া সেবা করিবার জন্য আরও দুইটি স্ত্রীলোক শশীর ছিল। জোয়ান ছেলে হাবলের ছিল স্ত্রীর উপর একটা। শশী পাকিমদ

ছাড়া খাইত না। ছাগল ভেড়ার পাইকার ইছু সেখের আনাগোনার বিরাম ছিল না। সপ্তাহে দুই-তিনটা বৃহদাকার খাসী সে শশীর বাড়ীতে বাঁধিয়া দিয়া যাইত। নবীন স্বর্ণকার রূপার চুড়ি, সোনার নাকছাবী, কানের টাপ তৈয়ারী করিয়াই দিন চালাইত! ডোম কন্যারা অঙ্গজ কিনিয়া দশদিন পর আধা দামে বন্ধক দিত—অথবা বিক্রয় করিত। আবার বিশ দিন পর নূতন কিনিত।

এই সময়েই শশী রোগে পড়িল। শশী একটা ডুলি ভাড়া করিয়া ধর্ম্মরাজের শরণাপন্ন হইল,—শুধু ডুলি নয়—সঙ্গে সঙ্গে একখানা ভাড়ার গাড়ী—গাড়ীতে গেল—স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ ও হাবল।

সপ্তাহখানেক না যাইতেই শশী অস্থির হইয়া উঠিল, হাবলকে ডাকিয়া দাঁত কিষ কিষ করিয়া বলিল আমাকে মেরে ফেলবি নাকি—তুই মনে করেছিস কি?

হাবল বলিল—অই—তুমি বলছ কি? রোগ কি তোমার আমি ক'রে দিয়েছি নাকি?

ভীষণ ক্রোধে শশী চীৎকার করিয়া উঠিল—হারামজাদা শালা—কাটা গাছের মত আমি প'ড়ে থাকব কতদিন শুনি?

হাবল শশীকে ভয় করিত, বাপ বলিয়া নয়—বনের পশুতে যে হিসাবে বাঘকে ভয় করে—সেই হিসাবে ভয় করিত; একা হাবল নয়—এই ডোমপাড়ার সকলেই তাহাকে ভয় করিত। হাবল এবার মিষ্ট করিয়া বলিল—তা আমি কি করব বল?

—ডাক্তার নিয়ে আয়—হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে। ফুঁড়ে ওষুধ দিক। এমন শুয়ে থাকতে আমি পারছি না।......শালার ধর্ম্মরাজ—! অকস্মাৎ সে ধর্ম্মরাজকে গালিগালাজ আরম্ভ করিল।

সত্যই—এ অবস্থা শশীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রে হাবল যখন ঘন অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দ ক্ষিপ্র পদক্ষেপে উঠান পার হইয়া বাহির

দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যায়—শশী তখন অস্থির হইয়া উঠে; মুখে লাথি মারিয়া সে-দিন সে একটা সেবাদাসীর সামনের দুইটা দাঁতই ভাঙ্গিয়া দিল। মেয়েটা সেই রাত্রেই পলাইয়া গেল। পাড়ায় সন্ধ্যায় যখন গান বাজনার আসর বসে—তখন শশী গালিগালাজে বাড়ীটাকে কদর্য্য করিয়া তোলে; কিন্তু বাড়ীটা নির্জ্জন—শুনিবার কেহ নাই, শশী আক্রোশে ক্রোধে উন্মত্ত অধীর হইয়া উঠে। স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ, সেবাদাসী—সব চলিয়া যায়; গান বাজনার মাতনে মাতিয়া কেহ হা-হা করিয়া হাসে—কেহ গান গায়, কেহ নাচে। কেবল ঘরের পাশেই শশীর বিধবা ভ্রাতৃবধূ গুণ গুণ করিয়া কাঁদে তাহার মৃত পুত্র ফিঙের জন্য! ফিঙেকে ঠ্যাঙাইয়া মারিয়াছে কৃপণ চৌধুরী। চৌধুরীর গোলাটি ফাঁক করিয়া দিয়াছে কিন্তু প্রতিশোধ হয় নাই! শশী নিস্ফল আক্রোশে চুল ধরিয়া টানে! শশী একদিন চেষ্টা করিল ঘরে আগুন ধরাইয়া দিতে। না পারিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিল। এমনি অস্থিরতার মধ্যে শশী ধর্ম্মরাজকে গালিগালাজ করিয়া হাবলকে ডাক্তার আনিতে হুকুম করিল। হাবল ডাক্তারই লইয়া আসিল। ডক্তার ইনজেকসন দিতে আরম্ভ করিলেন। শশী মিনতি করিয়া বলিল—ভাল ক'রে দেন আমাকে ডাক্তারবাবু, আমি আপনাকে একটা সোনার 'আঙ্গুটি' গড়িয়ে দোব।

ডাক্তার হাসিলেন।

ঠিক এই সময়েই আরম্ভ হইয়া গেল—বি-এল কেস।

আসামীদের মধ্যে শশীও ছিল—এবং সেইই ছিল প্রধান আসামী। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের আপিসেই বিচার হইতেছিল। পঙ্গুপ্রায় শশী একখানা গরুর গাড়ীতে করিয়া যাইত, সেখানে হাবল এবং আর একজন তাহাকে জড় একখানা প্রস্তরখণ্ডের মতই ধরাধরি করিয়া একস্থানে বসাইয়া দিত। এইখানেই তাহার ভাণ শিক্ষার হাতেখড়ি। আপনার অজ্ঞাতসারেই সে সত্যকার অবস্থার অপেক্ষাও অনেক বেশী আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিত। নাকের ডগায় মাছি বসিলেও সে হাত নাড়িত না, চোখের

তারা দুইটাকে নাকের পাশে আনিয়া মাছিটার পাখার কম্পন ও পা-নাড়া দেখিত, হঠাৎ বিরক্ত হইয়া মনে মনে মাছিটাকে অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়া মাথা নাড়িয়া সেটাকে তাড়াইত।

ইহাতেই সে খালাসও পাইয়া গেল। হাকিম যথেষ্ট প্রমাণ সত্বেও তাহার অবস্থা দেখিয়া জেলে পাঠাইলেন না, শশী ডাক্তারকে সাক্ষী মানিয়াছিল—তাহারই কথার উপর নির্ভর করিয়া হাকিম তাহাকে রেহাই দিলেন। ডাক্তার সত্য কথাই বলিয়াছিল—সে শশীর চিকিৎসা করিতেছে, দুরন্ত বাত ব্যাধিতে সে আক্রান্ত। এ রোগ সারিতেও পারে—সারিলেও অচিরে সারিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতির প্রতিশোধই তাহার যথেষ্ট শাস্তি বিবেচনায় তাহাকে বাদ দিয়া হাকিম অপর সকলের উপর দীর্ঘ কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

কোর্ট-রুমের বাহিরে আসিয়াই শশী কদর্য্য ভাষায় ডাক্তারকে গালিগালাজ আরম্ভ করিল; শালা খুনে মানসুরো জোচ্চোর! ভাল হবে না তো ফাঁকি দিয়ে টাকা নিলি কেনে আমার, প্যাঁট-প্যাঁট ক'রে ফুঁড়ে ফুঁড়ে আমাকে মারলি কেনে? ছোট ছেলের মত সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছিল।

তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছেলে ভাইপো ভাগ্নে জামাই—সবাই চলিয়া যাইবে; সে এই অক্ষম পঙ্গু দেহ লইয়া না খাইয়া শুকাইয়া মরিবে, স্ত্রী-কন্যা সকলকে শুকাইয়া মারিবে, বধূরা পলাইয়া গিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিবে, সব দেখিতে হইবে। মালসামালদারেরা একটি পয়সা দূরে থাক একমুঠা চাল দিয়াও সাহায্য করিবে না। অন্তত, ডাক্তার যেকথা আজ আদালতে হলপ করিয়া বলিয়াছে—তাহার পর ইহা নিশ্চিত। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াও তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না, আক্রোশে আক্ষেপে দুর্দ্দান্তভাবে আপনার বুক চাপড়াইতে ইচ্ছা হইতেছিল; হাত সে নাড়িতে পারে—কিন্তু হাত নাড়িতে তাহার সাহস হইল না। চারিদিকে লোক। দুইজন কনেষ্টবল অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। মোটর

গাড়ীর পা-দানে পা রাখিয়া হাকিম ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টবাবুর সহিত কথা বলিতেছেন।

ডোমেরা আপীল করিল। কিন্তু ফলে দুই-চারিমাস করিয়া দণ্ড-লাঘব ছাড়া অন্য কোন কিছু হইল না, খালাস কেহ পাইল না।

সেদিন ডোমেদের আত্মসমর্পণের দিন। সদরে গিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সমস্ত পাড়া জুড়িয়া কান্নার রোল উঠিল। কনেষ্টবল দারোগা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। এত দুর্দ্দশার মধ্যেও গত রাত্রে খাসী কাটিয়া মাংস রান্না হইয়াছিল। বিদায়-ভোজ জাতীয় ব্যাপার। ইংরেজী ফ্যাশানের অনুকরণে নয়—তিন পুরুষ ধরিয়া তাহাদের এই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। বাসি মাংস ও ভাত খাইয়া—পান মুখে দিয়া ডোমেরা ম্লানমুখে চলিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে গেল। ষ্টেশনে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া ফিরিবে। পথে বাহির হইয়া তাহারা চীৎকার করিয়া কান্না বন্ধ করিল। এখন তাহারা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। ফিরিবে তাহারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে। এই নিয়ম। জনশূন্য ডোম-পল্লীতে পড়িয়া রহিল শুধু দুটি পুরুষ। শশী আর শশীর দাদা অভিলাষ। শশী পঙ্গু—অভিলাষ অন্ধ।

শশী মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। অকস্মাৎ সে মাথা তুলিয়া দেখিল—সকলে চলিয়া গিয়াছে। সে ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল—কিছুই দেখা গেল না—ঘাড় উঁচু করিয়াও পাঁচিলের ওপার নজর হয় না। সম্মুখস্থ খুঁটিটাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া একটু উঁচু হইতে সে চেষ্টা করিল। এবার মাথাগুলা দেখা যায়। আরও একটু ভর দিয়া—আর একটু—আরও একটু—হ্যাঁ, এইবার সকলকে দেখা যাইতেছে। সারি সারি সব চলিয়াছে ওই যে হাবল! নূতন পুকুরের উঁচু পাড়ের আড়ালে দলটা অদৃশ্য হইয়া গেল; শশী এবার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া—আনন্দে উল্লাসে একটা উৎকট চীৎকার করিয়া

উঠিল। ভাষাহীন আদিম মানুষের উল্লাসধ্বনির মত সে ধ্বনি বর্ব্বর, উচ্চ ও অকপট!

সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে! কিন্তু পরক্ষণেই সচকিত হইয়া সে বসিয়া পড়িল! কে কোথায় মানুষ আছে, কে জানে!

সে-দিন সমস্ত দিন ধরিয়া শশী গভীর ভাবনা ভাবিল। শুধু নিজের ভাবনা নয়, স্ত্রী-কন্যা আত্মীয়া বালক শিশু—সমগ্র ডোম পাড়ার মেয়ে ও ছেলেদের ভাবনা সে ভাবিল। গণিয়া হিসাব করিয়া সে দেখিল সর্ব্ব-সমেত চৌদ্দটি মেয়ে, ছয়টি ছেলে। দুইটা ছেলে, বেশ ডাঁটো হইয়া উঠিয়াছে রাখালী করিয়া নিজের ভাতকাপড় তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে—উপরন্তু সংসারে কিছু দিতে পারিবে। এ ছাড়া রাত্রে বাহির হইবার যোগ্যতা তাহাদের না হইলেও দিনের সুযোগে এবং সন্ধ্যাতেই আঁচল ভরিয়া ধান চাল—তরি-তরকারি আনিবে।

পরক্ষণেই সে শিহরিয়া উঠিল। মনে পড়িল—আজিকার প্রাতঃকালে ডোম জোয়ানদের সেই শোভাযাত্রা—মনে পড়িল সমগ্র পাড়াটার অসহায় অবস্থা। মনে পড়িল ফিঙের মৃত্যু! না—আর চুরি নয়, চুরি আর সে কাহাকেও করিতে দিবে না। হাত দুইটা সঞ্চালন করিয়া সে দেখিল—সে পারিবে, ডোম-কাটারি লইয়া বাঁশের তালপাতার কাজ সে বেশ করিতে পারিবে। মেয়েগুলা তালপাতার চাটাই বুনিবে, পাতার শির দিয়া ঝাঁটা বাঁধিবে, বাঁশের ছিলকা দিয়া পাখা, ডালা, কুলা, সাজি তৈয়ারী করিবে—সে নিজে মোড়া তৈয়ারী করিবে, খল্‌পা বুনিবে। এছাড়া আর উপায় নাই—যুবতী কন্যা বধূগুলি অভাবের অজুহাতে উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবকে বাঁধ-ভাঙ্গা জলের মত অধীর মুক্তি দিয়া যাহা করিয়া বসিবে সে কল্পনা করিয়া রুগ্‌ণ শশীর শীতল রক্ত যেন জমিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তাহার মনে পড়িল—সে যে-বার প্রথম জেলে যায়—সেবারও এমনি পাড়াশুদ্ধ পুরুষের জেল হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিয়াছিল—তাহার ছোট বোনটা ঝুমুরের

দলে পলাইয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম পক্ষের কিশোরী বধূটা গ্রামান্তরে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছে। পাড়ার তিনটা মেয়ে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। বাকী মেয়েগুলির অর্দ্ধেকেরও বেশী কুৎসিত ব্যাধিতে ভুগিতেছে।

শশীর বর্ত্তমান স্ত্রী একটু হাবা গোছের, চিন্তান্বিত শশীকে দেখিয়া সে বলিল—ঘুম আইচে না কি গো ?

শশী বলিল—হাঁ।

হাবলের সেবাদাসীটা আজ ষ্টেশন হইতেই ভাগিয়াছে, সে আর ফেরে নাই। শশী ঠিক করিল—তাহার সেবাদাসীটাকে সে কাল খেদাইয়া দিবে। পরক্ষণেই মনে হইল—না, মেয়েটা তালগাছে চড়িতে পারে, তাহার উপর কর্ম্মঠ, ডোমের কাজ সে ভালই জানে। তাড়াইতে হইলে ওই হাবা স্ত্রীটাকেই তাড়াইতে হয়। কিন্তু সে হাবলের মা, সরলার মা; তাহার উপর শশীর অনুপস্থিতিতে হাজার অভাবেও সে অন্যায় কিছু করে নাই। আর যতবার শশীর জেল হইয়াছে—ততবার সে যে বুক-ফাটা কান্না কাঁদিয়াছে, সে শশীর বুকে যেন গাঁথা হইয়া আছে।

রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, পাড়াটা আজ নিস্তব্ধ। মনে হয় যেন গভীর রাত্রি। শশী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল—অকারণে।

শশীর স্ত্রী আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—অই—অই—তুমি উঠে দাঁড়াইচ লাগছে ! ওলো সরলা।

ফেউ ডাকিলে বাঘ যেমন ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করে শশীও ঠিক তেমনিভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—অ্যা—ও !

শশীর স্ত্রী স্তব্ধ হইয়া গেল, শশী বলিল—একটি একটি করিয়া, দৃঢ় কঠিন স্বরে—টুঁটিতে পা দিয়ে মেরে দোব কাউকে বলবি তো !

সমস্ত বাড়ীটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। শশী আবার বলিল—পুলিশ জানতে পারলে আমাকে শুদ্ধ জেলে পাঠাবে আবার।

ধীরে ধীরে সে দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

সমস্ত পাড়াতে সেই ব্যবস্থাই শশী প্রবর্ত্তিত করিল—কঠোর দৃঢ়তার সহিত—বর্ব্বর জাতির রাজার মত। বলিল—আমার তো মরণদশাই হয়েছে, খুন ক'রে না হয় ফাঁসিই যাব!

অন্ধ অভিলাষও আসিয়াছিল, সেও শশীকে সমর্থন করিল—বৃদ্ধ অপারগ মন্ত্রীর মত। অন্য সকলেও সদ্য-আপনজন-বিচ্ছেদে আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিয়াছিল, সকলেই একথা মানিয়া লইল।

ডোম-পাড়ায় উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস-বিলাসের পরিবর্ত্তে একটা কর্ম্মপ্রবণতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। একদিন দারোগা আসিয়া সমস্ত দেখিয়া খুশী হইয়া বলিলেন—তুই বেটার নাম পাল্টে দিলাম রে শশী। ঋষি বলে ডাকব তোকে—তুই বেটা ঋষি বনে গেছিস।

শশী কৃতজ্ঞ হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া প্রণাম করিবার জন্য উঠিল। দারোগা বলিলেন—দাঁড়াতে পেরেছিস?

শশীর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে লাঠিটা টানিয়া লইয়া ভর দিয়া অতিকষ্টে দুই পা হাঁটিয়া দারোগাকে প্রণাম করিয়াই কাঁপিতে লাগিল—ভয়ে সে সত্য সত্যই কাঁপিতেছিল। দারোগা বলিলেন—একটু একটু ক'রে অভ্যেস করিস হাঁটা—নইলে পা জমে যাবে।

দারোগা নিজে একটা সাজি, একটা মোড়া এবং খানকয়েক পাখা কিনিয়া লইয়া গেলেন।

শশী উঠিয়া বিনা লাঠিতেই ধীরে ধীরে দাওয়ায় আসিয়া বসিল। দিন কয়েক অপেক্ষা করিয়া সে লাঠি হাতে পাড়ায় বাহির হইল। কিন্তু যন্ত্রণায় মুখ মুহুর্মুহু বিকৃত হইতেছিল। সে তাহার ভাণ। পাড়ায় গাছটার ছায়ায় বসিয়া মেয়েগুলি ক্ষিপ্র হাতে বাঁশ তালপাতা লইয়া কাজ করিয়া চলিয়াছিল।

কিন্তু সে কয়দিন?

মাস তিনেক পরেই একদিন সে শুনিল—একটা টেড়িকাটা ছোঁড়া শিষ দিতে দিতে পাড়ায় যাওয়া-আসা করিতেছে। সে কতকগুলা ঢেলা সংগ্রহ

করিয়া রাখিল। সন্ধ্যা হইতেই শশী সতর্ক ছিল—শিষের শব্দ শুনিয়া শব্দভেদী বানের মত এমন ঢেলা ছুঁড়িল যে শিষ বন্ধ হইয়া গেল।

শশী চীৎকার করিয়া হাঁকিয়া বলিল—কাস্তেতে ক'রে শালার জিভ কেটে লোব। শিষ দেবে আমার পাড়ায়!

শিষ বন্ধ হইল, কিন্তু দূর হইতে সিটি বাঁশী বাজা শুরু হইল। শশী খোঁজ করিয়া দেখিল—পাড়ার কাজ অর্দ্ধেক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিল—মেয়েগুলার পরণে বাহারে-পাড় মিলের শাড়ী। সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—এই দেখ, খুন ক'রে ফেলাব আমি।

শশীর ভাইঝি—অভিলাষের কন্যা সুরধুনী মুখরা মেয়ে, আবার পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে—সে মুখের উপর জবাব দিল—ভাত কাপড় দিবি তু? আমি উ খাটনি খাটতে লারব। বলিয়াই সে ছুটিয়া পালাইল। শশীর ইচ্ছা হইল সেও ছুটিয়া গিয়া হারামজাদীকে ধরিয়া টুঁটিটা টিপিয়া ধরে; কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল। দিন তিনেক পরেই শশী সকালে উঠিয়া শুনিল—সুরধুনী গত রাত্রে পলাইয়াছে। এখানকার ধান-কলের ছোকরা মিস্ত্রি তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। শশী আপনার উঠানে এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত অস্থির পশুর মত ঘুরিতে আরম্ভ করিল। তাহার কন্যা সরলাও ছিম-ছাম হইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাবলের বউটা বাপের বাড়ী গিয়া আর কিছুতেই আসিতেছে না। পদচারণার অস্থিরতা তাহার বাড়িয়া গেল। আকাশ-পাতাল চিন্তায় সে অধীর হইয়া উঠিল। অভিলাষের বউ কাঁদিতেছে, সুরধুনীর দৌলতেই তাহাদের ভাত-কাপড় জুটিতেছিল। শশীর দৌরাত্মোই সে দেশছাড়া হইয়াছে।

অপরাহ্নে শশী বাড়ীর সম্মুখে গাছতলায় বসিয়া ছিল, দেখিল স্ত্রীর হাত ধরিয়া অভিলাষ চলিয়াছে; অভিলাষের স্ত্রীর হাতে একটি ছোট ডালা! সে চমকিয়া উঠিল—বলিল—কোথা চল্লি দাদা?

অভিলাষ উত্তর দিল না।

শশী আবার ডাকিল—দাদা!

অভিলাষ তবু উত্তর দিল না।

সক্রোধে শশী বলিল—ওরে শালা কানা, বলি কালাও হয়েছিস না কি?

অভিলাষও গর্জ্জন করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল—কি বললি হারামজাদা?

—বলি, চললি কোথা?

—মরতে। ভিখ করতে চললাম।

—ভিখ করতে? বেনো· ডোমের ছেলে হ'য়ে তোর মরণ নাই—কানা ভেঁড়া!

অভিলাষের অন্ধচক্ষুও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, সে বলিল—তু দিবি আমাকে খেতে?

—দোব। ফিরে আয়।

তৎক্ষণাৎ সে দৃঢ়পদে বাড়ী ঢুকিয়া আপন সম্বল হইতে একটা সিকি আনিয়া তাহাকে দিয়া বলিল—দু আনা ক'রে পয়সা তোকে আমি রোজ দোব। খবরদার, বাড়ী থেকে পা বার করবি না।

অভিলাষ ফিরিয়া গেল। কিন্তু তাহার বউ আপত্তি করিল—তোর ভিখ লোব কেনে?

শশী একটা আঙুল দেখাইয়া বলিল—বাড়ী যা!

অভিলাষের বউ আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

রাত্রেও সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

সহসা তাহার মনে হইল তাহারই বাড়ীর পিছনে কে ফিস ফিস করিয়া কথা বলিতেছে। মনটা তাহার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—বিদ্যুৎরেখার মত মনে একটা ছবি ভাসিয়া উঠিল—ছিম-ছাম সরলার ছবি। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিল—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল কে একটা লোক উপরে কাহার সহিত কথা বলিতেছে। কান পাতিয়া শুনিয়া বুঝিল—উপরের জানালায় কথা বলিতেছে সরলা। সে একটা ঢেলা তুলিয়া সজোরে ছুঁড়িল

লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া—ঢেলাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বোঁ শব্দ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। লোকটা ছুটিয়া পলাইল—ক্রোধে আত্মহারা শশী আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না—সেও ছুটিল। কিছুক্ষণ পর সে অনুভব করিল—অন্ধকারের মধ্যে লোকটা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে একটা বিপুল উল্লাস অনুভব করিল। আকাশ-পাতাল জোড়া নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটিয়াছে; বুকটা ধড় ফড় করিতেছে, যেন ফাটিয়া যাইবে—তবুও এ কি উল্লাস। হাউইয়ের অগ্নিবর্ষী উল্লাসের সঙ্গেই তাহার এ উল্লাস তুলনীয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিয়া সে নিঃশব্দ সঞ্চরণে গ্রামের গলি পথ ধরিয়া চলিল। গলিপথের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তাহার প্রবৃত্তি যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছিল। এক জায়গায় সে থমকিয়া দাঁড়াইল। চৌধুরীর বাড়ী! উঠানে প্রকাণ্ড ধানের গোলা। চৌধুরী ফিঙেকে হত্যা করিয়াছে! শক্তির দম্ভ করে সে! সে হাত তুলিয়া পাঁচিলের মাথা ধরিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল; মুহূর্ত্তে সে উপরে উঠিল। আপন শক্তিতে আপনিই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সন্তর্পণে নীচে লাফ দিয়া পড়িয়াই তাহার মনে হইল সে করিয়াছে কি? ধান সে লইবে কি করিয়া? বস্তা তো আনে নাই! সেই মুহূর্ত্তেই উচ্ছিষ্টভোজী বিড়ালটার পায়ের চাপে বাসনের শব্দ উঠিল—ঠুং-ঠাং।

শশী বিস্ফারিত নেত্রে বাসনগুলার দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তে অনেক কথা মাথার ভিতরে হু হু করিয়া খেলিয়া গেল। ধানের বোঝা অনেক ভারী! হাজার সুস্থ হইলেও পূর্ব্ব শক্তি তাহার আর নাই! অল্প বাসনে দাম বেশী হইবে! ধান চুরিতে সঙ্গীর প্রয়োজন—বাসন একাই চলিবে!

সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িল—আলনা হইতে একখানা গামছা টানিয়া বাসনগুলি বাঁধিয়া—সে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। দুয়ারটা খুলিতে গিয়া দেখিল—দুয়ারে তালা। চৌধুরী ঘুঘু হুঁসিয়ার লোক! সে হাসিল। পরক্ষণেই সে পাঁচিলের দিকে ফিরিল। একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। জেলখানায় এক বন্ধু তাহাকে বলিয়াছিল, চুরিতে দুয়ার লইয়া কারবার মানা

—কারণ, দুয়ারের সম্মুখেই থাকে পথ—আর দুয়ার খুলিতে গেলেই হয় শব্দ। দুয়ার লইয়া কারবার ডাকাতের—যাহারা দুয়ার রাখিতে পারিবে শক্তিবলে, তাহাদের। শশীই বলিয়াছিল—যদি ঠ্যাং চেপে ধরে?

বন্ধু উপদেশ দিয়াছিল—তেল মেখে যেয়ো। একটানেই 'তেলই—হাত পিছলে গেলি'।

ভাবিতে ভাবিতে সে পাঁচিলের উপর উঠিয়া পড়িয়াছিল। লাফাইয়া পড়িল নিরাপদ গলিতে। মনে মনে বন্ধুকে ধন্যবাদ দিল শশী।

তারপর শুধু অভাব পূরণ নয়—এ এক নেশা। একটা খেলা!

মহাজন চন্দ মহাশয় তাহার মাল সমালদার। চন্দ মহাশয় শশীর পুরাতন পৃষ্ঠপোষক মহাজন। বহু কারবারের কারবারী, ধান হইতে মনোহারী পর্য্যন্ত। প্রতিভাশালী ব্যক্তি। শশীর সহিত নূতন কারবার ফাঁদিবার সঙ্গে সঙ্গেই কাচের বাসনের কারবার খুলিয়া বসিলেন—'গ্লাস উইথ কেয়ার' রাণীমার্কা বাক্সে তিনি ফেরৎ কাচের বাসনের বদলে—কাঁসার বাসন পাঠান —সেখানে বিক্রয় হয়। শশী তাঁহার আঁস্তাকুড়ে পুঁতিয়া মাল রাখিয়া আসে। দর, থালায় আট আনা, বাটি গেলাসে চার আনা—তাই সে শুধু থালাই চুরি করিয়া থাকে।—দিনে পঙ্গুর মত বসিয়া কাতরায়।

ভুল হইয়া গেল—অমৃত ঘোষালের বাড়ীতে; কয়েক মুহূর্ত্তের ভুল।

একটানা প্রায় মাইল দেড়েক দৌড়িয়া সে থামিল নদীর ধারে। নদীতে জল অবশ্য নাই—স্নুতরাং বাধার জন্য নয়; বুকের ভেতর ফুসফুসটা যেন আর শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ওদিকে—পূর্ব্বদিকও ফরসা হইয়া আসিয়াছে। নদী পার হইয়াই লোকালয়ের পর লোকালয়;—মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে বাদশাহী শড়ক—ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পথটা জাগিয়া উঠিবে যেন আমীরী চালে। গাড়ী গরু লোকজন কলরব ধুলায় ভরিয়া উঠিবে। নদীর ঘাটের বাঁ দিকে একটা জঙ্গল—মহাশ্মশান বলিয়া

প্রসিদ্ধ—ওখানে নাকি পুষ্করা কাটায়; মানুষ ওদিকে যায় না। শশী ওই বাঁ দিকেই ফিরিল। দিগন্ত-শিখরে সূর্য্য তখন উঠি উঠি করিতেছে। শশী নিশাচরের মত অরণ্যের অন্ধকারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নদীর ধারে পলিমাটির উপর ঘনসন্নিবিষ্ট শীর্ণ দীর্ঘদেহ বড় বড় গাছ, নীচে কণ্টকগুল্ম সমাচ্ছন্ন। জঙ্গলটায় জানোয়ার নাই, সাপ আছে। শশী খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটা গুল্মের মধ্যে এক টুকরা পরিচ্ছন্ন স্থান বাহির করিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অগাধ ঘুম!

যখন সে উঠিল তখন সূর্য্য মাথার উপরে। শরতের আকাশের সূর্য্য—রৌদ্র প্রখর এবং পরিচ্ছন্ন; শাণিত সূচের মত শরীরে বেঁধে—সেই রৌদ্র গাছের ফাঁকে ফাঁকে গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; এক ঝলক একেবারে মুখের উপর। পেটের ভিতরেও সূচ বিঁধিতেছিল। কাল খাইয়াছে সেই সন্ধ্যাবেলায়। তাহার উপর এই দুরন্ত দৌড়! বাপরে বাপরে! অমৃত ঘোষাল—বেটা বাম্না! বেটাকে যে এক চড় কষিয়া দিতে পারিয়াছে—ইহাতেও দুঃখের মধ্যে সে আনন্দ অনুভব করিতেছে! একটা কামড় দিয়া বেটার নাকটা অথবা একটা কান কাটিয়া লইতে পারিলে সে আরও সুখী হইত। ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পেটের ভিতর সূচ বিঁধিতেছে। উপায় নাই। নদীর জল সে আঁজলায় ভরিয়া পেট পুরিয়া খাইল। ব্যস্। এইবার এইবার এক ছিলিম তামাক—নিদেন একটা বিড়ি হইলেই আর চাই কি? তাহাতে আর রাজাতে তফাৎ কি? আঃ—দারোগাবাবুর টাঙ্গির মত গোঁফ খানিকটা ছিঁড়িয়া আনিলেও পাতায় পুরিয়া বিড়ির মত খাওয়া চলিত। নিস্তব্ধ অরণ্যের মধ্যে সে আপন মনেই হাসিয়া সারা হইল। বিড়ির অভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার সে শুইয়া পড়িল।

জাগিল সে সন্ধ্যায়। অন্ধকারের আভাসে অন্তরে অন্তরে তাহার চঞ্চল উল্লাস জাগিয়া উঠীল। প্রথমেই সে সন্তর্পণে জঙ্গলটার গভীর অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া এক প্রান্তে আসিয়া বসিল। সাপ জাতটাই অতি পাজী—ছুঁইলে

আর রক্ষা নাই। অন্ধকার একটু ঘন হইতেই মাঠে মাঠে আসিয়া একটা আকের ক্ষেতে ঢুকিয়া বসিয়া বসিয়া আক চিবাইতে আরম্ভ করিল। মিষ্টরস তাহার ভাল লাগে না—খানিকটা মদ হইত! মনে করিয়াই সে হাসিল—'কারে পড়িলে বাঘা ফড়িং খায়।' একগাছা শেষ করিয়া সে আর একগাছা আক চিবাইতে আরম্ভ করিল। মাঠ জুড়িয়া শেয়াল ডাকিয়া উঠিতেই সে উঠিল। প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গেছে। গ্রাম নিস্থতি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঠে মাঠে সে আসিয়া আপনাদের পাড়ার অদূরে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সন্তর্পণে আসিয়া ঘরের পিছনে একটা ঢিপির পাশে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

গুনগুন করিয়া কে কাঁদিতেছে! হাবলের মা। তাহাকে ডাকিবার জন্ম প্রবল ইচ্ছা হইল তাহার। সে ডাকিতও—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে খিল খিল হাসির শব্দে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। সরলা হাসিতেছে। দাঁতে দাঁত ঘরিয়া সে হিংস্র হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই কাহার ভারী আওয়াজ কানে আসিল—আরে তু তো বহুত রসবতী আছে। তোহার বাবা শালা তো ভাগলো, আব—তো তুহার দিন আইল। অঁা—?

কনেষ্টবল। দারোগা পাহারা বসাইয়া রাখিয়াছে! শশী একটা হিংস্র কৌতুক অনুভব করিল। সে হামাগুড়ি দিয়া নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! কিছুদূর আসিয়া সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে অভ্যস্ত নিঃশব্দ গতিতে অগ্রসর হইল। প্রথমে কিছু আহার প্রয়োজন। তারপর 'চন্দ' মহাশয়কে তুলিয়া টাকা লইতে হইবে! পাঁচটা টাকা তাহার এখনও প্রাপ্য আছে। পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়া উঠিতেছে! খানিকটা শক্ত কিছু পেটে না পড়িলে আর চলে না! বামনা—অমৃত ঘোষালের রান্নাঘরে ঢুকিয়া—খাইয়া দাইয়া সমস্ত উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে কি হয়? বেটা বামনা কিন্তু ভয়ানক পাজী!

এ বাড়ীটা কাহার? পাঁচিলগুলা নীচু—ওই যে একটা ভাঙনও আছে।

সে ঢুকিয়া পড়িল। গরীবের ঘর! হইলই বা, সে চায় খাদ্য, সম্পদের সন্ধানে তো সে আসে নাই। আবার সে ভাল করিয়া দেখিল, ঘরখানা শ্যামাঠাকরুণের। ব্রাহ্মণের বিধবা—একটি মেয়ে, একটি ছেলে। মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে ও-পাড়ার গাঁজাখোর হরিঠাকুরের সঙ্গে।

কিন্তু এত ভাবিবার তাহার সময় নাই। সে রান্নাঘরের দরজাটি সন্তর্পণে খুলিয়া ঢুকিয়া পড়িল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া হাঁড়িতে হাত দিল—এই ভাত—তারপর এই কড়ায় তরকারী! সেগোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল। বাঃ ঠাকরুণ রাঁধিয়াছে বড় চমৎকার! খাসা—এ যেন অমৃৎ!

সহসা একটা কচি ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। শশী একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সে সন্তর্পণে বাহির হইয়া শয়নঘরের দরজায় শিকল তুলিয়া দিল। ওঃ ওপাশে আর একটা দরজা—ঠাকরুন এ যে হাজার দুয়ারী বানাইয়াছে রে বাবা! আবার সে আসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। এ খাদ্য সে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না ছেলেটা এখনও কাঁদিতেছে।

—অ—বিম্‌লি—বিম্‌লি! ওলো অ এগুনি! ছেলে কেনে কাঁদে লো? বিমলা সাড়া দিল—মা! বলিয়া বোধ হয় ছেলেকে টানিয়া লইল—ছেলেটা চুপ করিয়াছে। ঠাকরুণ ও ঠাকুরণের মেয়ে উঠিয়া পড়িয়াছে। কন্যা বিমলার বোধ হয় ছেলে হইয়াছে। এগুনিকে ডাকিল যে!

শশী তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করবার চেষ্টা করিল।

ঠাকরুণ বলিল—বিমলা!

—মা!

—তোর কানের ফুল দুটো আছে?

—না।

—নাই? ঠাকরুণ গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শশী স্পষ্ট শুনিল। বিমলা বলিল—তোমার ঘুম আসেনি বুঝি, মা?

—কি যে করব আমি কাল—তাই ভেবে আমার ঘুম নাই মা। কাল

তুই আঁতুড় থেকে বেরুবি, দাই বিদেয় করতে হবে, এগুনি বিদেয় করতে হবে। পূজো-অর্চ্চা আছে। টাকা দূরে থাক—নাপতানীকে দেবার মত চাল শুদ্ধ ঘরে নাই।

ঠাকরুণের জন্য শশীর দুঃখ হইল। মনে মনে ঠাকরুণকে প্রণাম করিয়া সন্তর্পণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। এইবার চন্দ মহাশয়ের কাছে। তারপর সটান দশবিশ ক্রোশ পাড়ি! হাবল আসিয়া আপনার দেখিয়া লইবে। সরলা হারামজাদীর নাম সে মুখে আনিবে না। হাবলের মাকে সে কোন রকমে খবর দিয়া আনাইয়া লইবে।

রাত্রি শেষ প্রহর।

শশী যাইতে যাইতে দাঁড়াইল। আঃ ঠাকরুণের বড় অনিষ্ট করিয়া দিয়াছে সে! অন্যায় হইয়াছে তাহার। আঁতুড়ের খরচ, তাহার উপর বামুনের বিধবার সমস্ত হেঁসেল নষ্ট হইয়াছে, যাক গে! মরুক গে ঠাকরুণ, বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবে! সে চলিতে আরম্ভ করিল। আবার দাঁড়াইল। নাঃ—কাজটা ভাল হয় নাই। আহা বিধবা—গরীব!

সে আসিয়া ঠাকরুণের বাড়ীতে ঢুকিয়া তিনটি টাকা ট্যাঁক হইতে বাহির করিয়া দাওয়ার উপর রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সহসা তাহার মনে হইল —ওই 'এগুনি'টা যদি প্রথমে ওঠে তবে তো ওই মারিয়া দিবে। সে টাকা তিনটি কুড়াইয়া লইল; সেই মুহূর্ত্তেই মনে হইল তিন-তিনটা টাকা! না! হইতেই পারে না। মরুক,—ঠাকরুণ মরুক। কিন্তু তাহাতেও মনটা কেমন করিতেছে। সহসা অন্যমনস্ক শশীর শিথিল হাত হইতে একটা টাকা ঠং করিয়া দাওয়ার উপর পড়িয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—কে? ঠাকরুণ শঙ্কিত হইয়াই ছিল—ইহার পূর্ব্বে ঘরের শিকল দেওয়া দেখিয়া বিধবা পাড়া পড়শী জড় করিয়াছিল রান্নাঘরের ব্যাপারও সকলে দেখিয়াছে!

শশীর কিন্তু আর সময় নাই—আঃ—কোথায় গেল টাকাটা? চঞ্চল

ত্রস্ততায় তাহার হাত কাঁপিতেছে; সে কম্পনের মধ্যে বাকী দুইটাও ঠং ঠং শব্দে পড়িয়া গড়াইয়া গেল!

সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বর্দ্ধিত শঙ্কায় উচ্চতর কণ্ঠে বলিল—কে?

টাকা! তাহার টাকা! শশী সরীসৃপের মত চারিদিক হাতড়াইয়া ফিরিল।

ওদিকে বিধবা হাউমাউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—চোর—চোর—

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা—ওঘরে মেয়ে এবং এগুনিটা! শশী দাঁতে দাঁতে খামচ কাটিয়া দাওয়া হইতে উঠানে লাফ দিয়া পড়িয়াই ছুটিল। পাশের বাড়ীগুলাতেও লোক চেঁচাইতেছে। কাছেপিঠেই রামশরণ দারোগার গলা শোনা যাইতেছে। শশী গলিতে বাহির হইয়া ঠিক করিল আজ সে দারোগার গোঁফ ছিড়িয়া লইবেই—যদি আজ সম্মুখে সে পড়ে। নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে সে গলির ভিতর দিয়া চলিল; কৃষ্ণা চতুর্দশীর একটুকরা বাঁকা চাঁদ উঠিয়াছে—অন্ধকার কালকের মতই স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছে! গলি শেষ হইতেই সে চমকিয়া উঠিল—গলির মুখেই লোক। দারোগা নিজে ও একজন কনেষ্টবল। সে ফিরিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ওমাথাতেও লোকের সাড়া। লোক দুইটা হৈ হৈ করিয়া উঠিল। শশী আর কোন চেষ্টা করিল না, সে হাত দুইটি বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল—মেরেন না মশায়—হেই দারোগাবাবু!

দারোগা রামশরণ মহাকৌতুকে হা-হা করিয়া হাসিয়া শশীর বুকে ক্রেপসোল জুতার এক লাথি বসাইয়া দিলেন।

হাজতে বসিয়া—শশী ইসারা করিয়া একটা কনেষ্টবলকে ডাকিল—সরলার সঙ্গে রসিকতা করিতেছিল এই ব্যক্তিই।

অত্যন্ত গোপনে কাছা হইতে বাকী দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—সরলাকে দিও! হোক।

না

আট বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল যে হত্যাকাণ্ড তাহারই বিচার। নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দীর্ঘ আট বৎসর পরে দায়রা আদালতে তাহারই বিচার হইতেছে। আগামী কাল নিহত কালীনাথের স্ত্রী ব্রজরাণীর সাক্ষ্য গৃহীত হইবে।

ব্রজরাণী সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের মধ্যে ধ্যানস্তিমিতার মত বসিয়াছিল; হরদাসবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া একেবারে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন—এই যে ব্রজ!

ব্রজ মুখে কোন উত্তর দিল না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চাহিল মাত্র। হরদাসবাবু বলিলেন—কাল তোর সাক্ষীর দিন। মনকে একটু শক্ত ক'রে নিবি। শেখাবার তো কিছু নেই, কেবল ঘটনাগুলো স্মরণ ক'রে নে ভাল ক'রে। আমি বরং কাল সকালে তোকে তোর প্রথম এজাহারটা ভাল ক'রে শুনিয়ে দেব।

হরদাস আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ভাল করিয়া শুনাইয়া দিবে! মনে করাইয়া দিবে! ব্রজরাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এক বিচিত্র হাসি হাসিল। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ রেখায় পরিস্ফুট নিঃশব্দ হাসি, হাসির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় চোখ দুইটি স্তিমিত হইয়া আসিল; উত্তেজনাহীন স্থির হিমশীতল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিচিত্র সে হাসি!

ব্রজরাণীর মনে বাটালীর আঘাতে কাটিয়া গড়া পাথরের মূর্ত্তির মত সে ছবি অঙ্কিত হইয়া আছে, সে কি মুছিবার, না, মুছিয়া যায়!

হতভাগ্য নিহত কালীনাথের বিধবা স্ত্রী ব্রজরাণী।

উঃ! সে ভীষণ শব্দ! সে যেন মৃত্যুর হুঙ্কার-ধ্বনি। বার বার! হাতটা প্রথম ভাঙ্গিয়া গেল, তার পর আবার, তার পর আবার, বার-বার! রক্তাপ্লুত দেহে স্বামী তাহার লুটাইয়া পড়িল তাহার চোখের সম্মুখে।

ব্রজরাণী সে মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, সে সভয়ে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল। স্বামীর সেই রক্তাক্ত মূর্ত্তি আজও তাহাকে আতঙ্কিত করিয়া অস্থির করিয়া তোলে। প্রায় রাত্রেই স্বপ্নে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে, তাহার মা তাহার পাশে শুইয়া গায়ে হাত দিয়া থাকেন, সেই অভয়স্পর্শ নিদ্রার মধ্যেও সে অনুভব করে। সে-হাত কিছুক্ষণ সরিয়া গেলেই আতঙ্কে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

ব্রজরাণী ত্রস্ত পদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইতেই মা প্রশ্ন করিলেন—কি রে? এমন ক'রে—?

প্রশ্নের আধখানা বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন, তাঁহার নিজের মনই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে।

ওদিকের বারান্দায় এক ভ্রাতৃবধূ যেন শুনাইয়া বলিল—বাপের জন্মে এমন ভয় দেখি নি কিন্তু। আজ আট বছর হয়ে গেল—।

মা শাসন-কঠোর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—বউমা!

বধূ মুখ বিকৃত করিয়া একটা ভঙ্গী করিয়া নীরবে ইঙ্গিতে বাকী মনোভাবটা প্রকাশ করিয়া তবে ছাড়িল। মা ব্রজরাণীকে কাছে বসাইয়া তাহার রুক্ষ চুলের বোঝা লইয়া বসিলেন, পিঙ্গল রুক্ষ চুলে জটিলতার রাও অন্ত নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রজরাণী আজও তেল ব্যবহার করে নাই।

ব্রজরাণীর বড় ভাই হরদাসবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন—মা!

মা মুখ তুলিয়া হরদাসের দিকে চাহিলেন; হরদাস বলিলেন—একটা কথা ছিল মা।

—কি বল।

—একটু উঠে এস।

—এইখানেই বল না।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরদাস বলিলেন—সেই ভাল। ব্রজরই শোনা দরকার বিশেষ ক'রে। আবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—মানে, ব্রজরাণীর ছোট মামাশ্বশুর আর ওদের বেয়াই এসেছেন, দেখা করতে।

মামাশ্বশুর? ব্রজরাণীর স্বামীহন্তার পিতা আর তাহার শ্বশুর। ব্রজরাণীর মায়ের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। ব্রজরাণী চঞ্চল হইয়া মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিল, যেন মামাশ্বশুর কাছেই কোথাও রহিয়াছেন। মা বলিলেন—কেন? কি জন্যে? কি দরকার তাঁর? কেন তিনি বার বার আসেন? উত্তরোত্তর তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল।

হরদাস বলিলেন—বলবেন আর কি? সেই কথা—ক্ষমা! যা হয়েছে তার উপর আর হাত নেই। এখন ভিক্ষা, ক্ষমা, কোন রকমে ক্ষমা—।

—ক্ষমা? মা কঠিন হাসি হাসিলেন। তার পর তিনি বলিলেন—তাঁকে বাইরে বাইরে বিদেয় ক'রে দেওয়াই তোমার উচিত ছিল বাবা।

—সে কি আর আমি বলি নি মা। বলেছি—বার বার বলেছি। কিন্তু আমার হাতে ধরে ভদ্রলোক ছাড়েন না। শেষে পায়ে ধরতে উদ্যত।

—তা হ'লে তাঁকে বল গে, ব্রজ আমার আজ আট বৎসর তেল মাখে নি, এই দিনটির জন্যে। ক্ষমা কি ক'রে করবে?

হরদাস নীরব হইয়া রহিলেন, আবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—আর একটা কথা মা। আমাকে যেন ভুল বুঝো না। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলতে। অনন্তের শ্বশুর বললেন, আমার মেয়ের প্রতি দয়া করতে হবে। যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তার পূরণ আজ ভগবানও করতে পারেন না। তবে মানুষের দ্বারা যেটুকু সম্ভব, যতটুকু পারা যায়—ব্রজর ভবিষ্যৎ আছে—তার ছেলেকে মানুষ করতে হবে—।

বাধা দিয়া মা বলিলেন—মানে টাকা দিতে চান—এই ত?

জ্যা-মুক্ত শরের মত মুহূর্ত্তে ব্রজরাণী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইয়া গেল, দৃঢ়কণ্ঠে বলিল না।

তারপর দৃঢ়পদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অনন্ত মামাতো ভাই, কালীনাথ তাহার পিতৃষসাপুত্র। কালীনাথ বয়সে কিছু বড়। কিন্তু যৌবনের একটা কোঠায় বিশ-ত্রিশের ব্যবধান বন্ধুত্বের সেতুবন্ধনে স্বচ্ছন্দে বাঁধা যায়, এ তো বৎসর-চারেকের ব্যবধান। সেই সেতুবন্ধনে অনন্ত এবং কালীনাথ পরস্পর প্রীতিবদ্ধ হইয়া একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াছিল। ভোর না হইতেই অনন্ত আসিয়া ডাকিত—কালী-দা! বাপস্ কি ঘুম তোমার! তাহার কাঁধে এক বন্দুক, পকেটে বোঝাই কার্ত্তুজ।

কালীনাথ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিবামাত্র সে উনানের ধারে উনান জ্বালিতে বসিয়া যাইত। কালীনাথ তখন অবিবাহিত, সংসারে বাপ মা ভাই ভগ্নি কেহ নাই, বাড়ীটা দুইটি তরুণের খেয়াল ও খুশী মত চলিবার একটি কল্পরাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কালীনাথ মুখ হাত ধুইতে ধুইতে অনন্ত চা তৈয়ারী করিয়া দুইটি পেয়ালায় পরিবেষণ করিয়া ফেলিত। তার পর গত রাত্রের উদ্বৃত্ত পাখীর মাংস সহযোগে প্রাতরাশ সারিয়া গ্রাম গ্রামান্তরের বন-জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইত। গ্রাম পার হইয়াই কালীনাথ পকেট হইতে ছোট কল্কে, সিগারেটের মিক্শ্চার,—আরও দুই একটা সরঞ্জাম বাহির করিয়া বসিত। অনন্ত দারুণ তৃষ্ণার্ত্তের মত বলিত —হ্যাঁ নাও, নইলে জমছে না। চোখের টিপ, বুঝেছ কি না—ও না হ'লে ঠিক আসে না।

অনন্ত নিতান্তই অল্পশিক্ষিত; মূর্খ বলিলেও চলে। কালীনাথ শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, সেও ঐ নেশায় আসক্ত। শুধু আসক্তই নয়, এ বিষয়ে অনন্তের গুরু সে-ই। তাহাদের দুই জনের মিলনের সেতুবন্ধনে এই বস্তুটিই ছিল কাঠামো।

একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অনন্ত রিপীটারটা খুলিয়া

একেবারে ছয়টা কার্তুজ ভর্তি করিয়া বলিত—ব্যস! চল এইবার। হাত কিন্তু আমার নিস্‌পিস্‌ করছে, কি মারি বল ত?

—দে, একটা মানুষই মেরে দে।

—বেশ, দাঁড়াও তুমি এখানে মানুষের মধ্যে তুমি। অনন্ত বন্দুকটা তুলিয়া ধরিত। কালীনাথ সভয়ে সরিয়া গিয়া বলিত—এই, এই অনু, ও-সব ভাল নয় কিন্তু। বাবা! ও হ'ল যমদ্বার, চাবি টিপলেই দোর খুলে যাবে।

অনু হি হি করিয়া হাসিয়া বন্দুকটা ফিরাইয়া লইত; কালীনাথ একটা গ্রামান্তরযাত্রী কুকুরকে অথবা আকাশচারী কোন পাখীকে দেখাইয়া দিত—ওই মার না, মারবার জানোয়ারের আবার অভাব! অনন্ত মুহূর্তে বন্দুকটা তুলিয়া ধরিত। প্রান্তরের অনভ্যস্ত আবেষ্টনীর মধ্যে অপরিচিত দুই জন মানুষের হাতে লাঠির মত অস্ত্রটাকে দেখিয়া ভীত কুকুরটার লেজ আপনি নত হইয়া আসিত, ভীত মৃদু শব্দ করিয়া সে ছুটিয়া পলাইত, কিন্তু অনন্তের লক্ষ্য অব্যর্থ। গতিশীল জীবনটা কোন-না কোন অঙ্গে আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া লুটাইয়া পড়িত, কখন মরিত, কখনও মরিত না। না মরিলে কালীনাথ বলিত—দে, আমাকে দে তো বন্দুকটা, বড় জানোয়ার—হাতের টিপ ক'রে নি।

কিছু দূরে দাঁড়াইয়া গুলির পর গুলি ছুঁড়িয়া সেটাকে সে বধ করিয়া হাসিয়া বলিত—একেই বলে কুকুর-মারা, এ্যা!

—চুপ!

—কি?

—মাথার ওপর পাখার শব্দ শুনছ না!

—হরিয়ালের পাখার শব্দ। ব'সে পড়, গুঁড়ি মেরে ব'সে পড়।

তারপর বন্দুকের শব্দে পাখির ভয়ার্ত্ত কলরবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি চকিত আলোড়িত হইয়া উঠিত। পিছনে জুটিত ছেলের দল, তাহারা হত্যার আনন্দ উপভোগ করিত, আর সংগ্রহ করিত কার্তুজের খালি খোল।

একসঙ্গেই দুইটি বিবাহের উদ্যোগ হইয়াছিল। ব্রজরাণীর পিতার বংশ

চাকুরের বংশ—দুই পুরুষ সরকারী চাকরি করিয়া বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা খুঁজিতেছিলেন—প্রতিষ্ঠিতনামা ধনীর ঘরের ছেলে। ওদিকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এক প্রাচীন জমিদারবাড়ী আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত হইয়া খুঁজিতেছিলেন—বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের পাত্র। সন্ধানী ঘটক দুই বিভিন্ন স্থান হইতে এই দুই সম্বন্ধ আনিয়া হাজির করিল। একপক্ষের জন্য অনন্ত ও অন্যপক্ষের জন্য কালীনাথকে সে খুঁজিয়া বাহির করিল। অনন্ত খুশী হইয়া বলিল—দাদা, তোমার পাত্রী দেখতে যাব আমি, আর আমার পাত্রী দেখতে যাবে তুমি।

কালীনাথ অনন্তের পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল—এক্সেলেণ্ট আইডিয়া! বহুত আচ্ছা ব্রাদার আমার রে!

ব্রজরাণীকে দেখিয়া কালীনাথ মুগ্ধ হইয়া গেল। তার পর সে দুইখানা বেনামী পত্র লিখিয়া বসিল। ব্রজরাণীর পিতাকে লিখিল, বড়লোকের ছেলে অনন্ত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে নেশাখোর দুর্দ্দান্ত গোঁয়ার, সকল রকম নেশাতেই সে অভ্যস্ত, তাহার উপর চরিত্রহীন।

আর তাহার যেখানে সম্বন্ধ চলিতেছিল, সেখানে লিখিল, কালীনাথ এম-এ পাস করিয়াছে সত্য কিন্তু নিতান্ত হাঘরে বংশের ছেলে। তাহার পিতা সরকারী চাকরী করিয়া যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষেও অকিঞ্চিৎকর। আরও একটি কথা—ছেলেটি বড় হীন-স্বভাবসম্পন্ন। হীনতাটা তাহাদের বংশানুক্রমিক। পাঠ্যজীবনে কয়েকবার সহপাঠীদের বই চুরি করিয়া সে ধরা পড়িয়াছে। জ্ঞাতার্থে জানাইলাম, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।

তার পর ঘটকের চেষ্টায় ঘটিল অন্যরূপ। সম্বন্ধ অদল-বদল হইয়া গেল। ঘটক বর্ণনা করিল কালীনাথের অবস্থা বেশ ভালই অর্থাৎ সূর্য্য থাকিলে যেমন চন্দ্রকে দেখা যায় না, তেমনি মাতুলবংশ বিদ্যমান থাকাতে ভাগিনেয় চোখে পড়ে না—অন্যথায় চন্দ্রই তমোনাশ করিতে পারিত। আর অনন্ত পাস না করিলেও লেখাপড়া বেশ ভালই করিয়াছে, তাঁহাদের ডিগ্রীর

প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন বিদ্যার। অতঃপর বিদ্বান কাহাকে বলে সে বিষয়ে বক্তৃতাও সে খানিকটা করিল। ফলে পাত্রী ও পাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দুইটি বিবাহই হইয়া গেল।

মাটির নীচে অন্ধকার রাজ্যের অধিবাসী উই; মধ্যে মধ্যে আলোক-কামনায় তাহাদের পক্ষোদ্গম হইলে আর রক্ষা থাকে না—তাহারা পিচকারির মুখের জলের মত গহ্বর পরিত্যাগ করিয়া বাহির হয়। পাখার শক্তি অপেক্ষা অহঙ্কারই হয় অধিক। অনন্তের শ্বশুরদের অনেকটা সেই অবস্থা। রক্ষণশীল জমিদারবাড়ীর সকলে অকস্মাৎ অবরোধ ঘুচাইয়া আলোকের নেশায় ঐ পতঙ্গগুলির মতই ফর ফর করিয়া উড়িতেছে।

ফুলশয্যার রাত্রেই বধূটি প্রশ্ন করিল—তোমার পড়ার ঘর বুঝি বাইরে?

অনন্ত প্রশ্নটা বেশ বুঝিতে পারিল না, বধূর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—পড়ার ঘর?

বধূটি সলজ্জভাবে নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিল—তোমার লাইব্রেরির কথা জিজ্ঞেস করছি আমি।

—লাইব্রেরি! তারপর সোজাসুজি ঘাড় নাড়িয়া সে বলিয়া দিল—ওসব লাইব্রেরি-টাইব্রেরি ধার-টার ধারি নে আমি। বছরে সরস্বতীর পূজো এক দিন—পাঁঠা কাটি, ফিষ্টি করি, ব্যস।

বধূ স্তম্ভিত হইয়া অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর সে যে সেই শুইল, আর সাড়াও দিল না, উঠিলও না। সাধ্যসাধনার মধ্যে অনন্ত আবিষ্কার করিল সে কাঁদিতেছে!

—কাঁদছ কেন? হ'ল কি? শুনছ?

বধূ নিরুত্তর। অনন্ত আবার প্রশ্ন করিল—কি হ'ল বলবে না? লক্ষ্মী, শোন, কথার উত্তর দাও!

—ওগো আমাকে আর জালিয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি।

কাতর কণ্ঠস্বরের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিরক্তির সুর গোপন ছিল না। অনন্ত

একটু আহত না-হইয়া পারিল না। তবুও সে আবার প্রশ্ন করিল—কি হ'ল সেইটে বল না!

—আমার মাথা ধরেছে। এবার বেশ পরিস্ফুট বিরক্তির সহিতই বধূ জবাব দিয়া বসিল। অনন্তও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। নিস্তব্ধ রাত্রি—শুধু তাহাদের বাড়ীর পাশের সারিবদ্ধ নারিকেল গাছগুলির কোন একটির মাথায় বসিয়া একটা পেচক কর্কশ স্বরে ডাকিতেছে। অনন্ত বিরক্ত হইয়া সরিয়া আসিল—তার পর অকস্মাৎ তাহার খেয়াল হইল কালীদাদা কি করিতেছে দেখিয়া আসিলে হয় না!

কালীনাথের বিবাহও এই বাড়ী হইতেই অনুষ্ঠিত হইতেছিল। বিবাহের আচার অনুষ্ঠান শেষ হইলে বর-বধূ আপনাদের বাড়ীতে গিয়া সংসার পাতিবে। অনন্ত কালীনাথের ফুলশয্যাগৃহের দরজায় আসিয়াই শুনিল ভিতরে স্বামী-স্ত্রীতে আলাপ চলিতেছে। সে কৌতুকপরবশ হইয়া কান পাতিল।

কালীনাথ বলিতেছে—তোমায় আমি রাণী বলেই ডাকব। আমার হৃদয়-রাজ্যের রাণী তুমি।

—দূর, সে আমার লজ্জা করবে। তার চেয়ে সবাই যা বলে তাই বলবে—ওগো।

—সে ত সকলের সামনে বলতেই হবে। কিন্তু তুমি আর আমি যেখানে শুধু, সেখানে বলব রাণী।

অনন্ত কালীনাথকে আর ডাকিল না, আপনার ঘরে আসিয়া আবার জানালার ধারে দাঁড়াইল। তাহার ভাগ্য! নতুবা এই মেয়ে ত তাহার স্কন্ধে পড়িবার কথা নয়!

নারিকেলগাছের মাথায় পেচকটা কর্কশ স্বরে আবার ডাকিয়া উঠিল। অকস্মাৎ অনন্তের সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল ঐ কর্কশকণ্ঠ নিশাচর পাখীটার উপর। সে ঘরের কোণ হইতে তাহার রিপীটারটা লইয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ

শব্দ লক্ষ্য করিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। আকস্মিক ভীষণ শব্দগর্জ্জনে রাত্রিটা কাঁপিয়া উঠিল, নারিকেলগাছের মাথাটায় একটা আলোড়ন বহিয়া গেল, কি একটা নীচে সশব্দে খসিয়াও পড়িল।

পিত্রালয়ে আসিয়া বধূটির পুঞ্জিত ক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। তাহার মুখ দেখিয়াই মা একটা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তিনি একান্তে ডাকিয়া মেয়েকে প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁরে, তোর মুখ এমন ভার কেন রে?

মুহূর্ত্তে কন্যা জ্বলিয়া উঠিল অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত—শেষকালে অশিক্ষিত মূর্খের হাতে আমাকে সঁপে দিলে তোমরা! একটা ফোর্থ ক্লাসের ছেলে যা লেখাপড়া জানে ও তা জানে না।

মা স্তম্ভিত হইয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; মেয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—সকাল থেকে ব্যাধের মত পাখী মেরে মেরে বেড়ায়। গুণ্ডার মত এ'কে মারা, ওকে চাব্‌কে শাসন করা হ'ল গৌরবের কাজ।

অনন্ত বাহিরে বেশ গম্ভীর ভাবেই বসিয়াছিল, সহসা তাহার এক শ্যালক একখানা ইংরেজী বই আনিয়া বলিল—এই জায়গাটা বুঝিয়ে দিন না জামাইবাবু!

অনন্ত রহস্য-যবনিকার বহির্ভাগেই ছিল; কিন্তু একটি ছোট শ্যালিকা আসিয়া একখানা ইংরেজী খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া সে যবনিকা ছিন্ন করিয়া দিল। বলিল—পড়ুন জামাইবাবু।

মুহূর্ত্তে সমস্ত বিষয়টা অনন্তের চোখের সম্মুখে আলোকিত পৃথিবীর মত পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। মাথার মধ্যে ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল আগুনের শিখার মত। কিন্তু কোন উপায় ছিল না, সে নীরবে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

দিনে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করিবার জন্য একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন—একটা কথা বলছিলাম বাবা—মানে, তোমার শ্বশুরের ইচ্ছে

—আমারও ইচ্ছে—তুমি এখন কলকাতায় থাক। আমার বড় ছেলে থাকে কলকাতায়, বাসাও রয়েছে—সেখানে থেকে পড়াশুনো কর।

অনন্তের ইচ্ছা হইল সে দৃপ্ত হুঙ্কারে বলিয়া উঠে—না, না, না! কিন্তু তাহা সে পারিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শাশুড়ী অনন্তের নীরবতায় সন্তুষ্ট হইয়াই চলিয়া গেলেন। 'হুঁ' না-বলিলেও বলাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

অপরাহ্নে শ্বশুর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—সেই কথাই লিখে দিলাম তোমার বাবাকে। সেই ভাল, এত অল্পবয়সে চুপচাপ ব'সে থাকা ভাল নয়। An idle brain is the devil's workshop কলকাতায় থেকে পড়াশুনো কর।

অনন্ত কোন কথা না-বলিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একেবারে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জিনিষপত্র সব পড়িয়া রহিল—সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল এবং বাড়ী ফিরিয়া যেন আক্রোশভরেই নেশা আরম্ভ করিল।

অকস্মাৎ একদিন অনন্তের পিতা ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে স্ত্রীকে বলিলেন—আমি অনন্তের বিয়ে দোব আবার। ছোটলোকের মেয়ে—মেয়ের বাপ হয়ে চিঠি লিখেছে দেখ না! আস্পর্দ্ধা দেখ দেখি—লিখেছে আমরা নাকি মূর্খ ছেলের বিবাহ দেবার জন্যে কালীনাথের নামে অপবাদ দিয়ে বেনামী চিঠি দিয়েছি! তুমি চিঠি লিখে দাও বেয়ানকে—মেয়ে যদি না পাঠিয়ে দেয়, ছেলের বিয়ে দেব আমি। চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিয়া তিনি ক্রোধভরেই বাহির হইয়া গেলেন।

অনন্ত ছিল পাশের ঘরেই। সমস্তই সে শুনিয়াছিল, বাপ বাহির হইয়া যাইতেই সে মায়ের ঘরে ঢুকিয়া মায়ের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া চিঠিখানা কাড়িয়া লইল।

নিতান্ত কটুভাষায় ঐ অভিযোগ করিয়া পত্রখানা লেখা। পরিশেষে লেখা

—প্রমাণস্বরূপ বেনামী পত্রখানাও এই সঙ্গে পাঠাইলাম আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-পত্র আপনাদের ইঙ্গিতক্রমেই লেখা হইয়াছিল।

বেনামী পত্রখানা উল্টাইয়াই অনন্ত চমকিয়া উঠিল, এ কি! এ যে অত্যন্ত পরিচিত হাতের লেখা। এ যে, এ যে—শ্বশুরের পত্রখানা মায়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া সে বেনামী পত্রখানা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল। একেবারে কালীনাথের বাড়ী আসিয়া ডাকিল—কালী-দা!

—কে, অনু? আয় আয়।

অনন্ত আসিতেই ব্রজরাণী ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া গেল। অনন্ত লক্ষ্য করিল, বাড়ীর চারিদিকে একটি লক্ষ্মীশ্রী, সুপ্রসন্ন শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতায় যেন উছলিয়া পড়িতেছে।

কালীনাথ বলিল—আর তুই আসিসই না!

—এলে খুশী হও কিনা সত্যি বল দেখি?

হা-হা করিয়া হাসিয়া কালীনাথ সে-কথার উত্তরটা আর দিলই না।

অনন্ত প্রশ্ন করিল—বউ খুব ভাল হয়েছে না?

অকপট প্রসন্নমুখে কালীনাথ বলিল—রাণীর গুণ একমুখে ব'লে শেষ করতে পারব না অনু। দেখছিস না ঘরদোরের অবস্থা। তুইও বৌকে এইবার নিয়ে আয়, বুঝিল!

অনন্ত চুপ করিয়া রহিল। কালীনাথ বলিল—তারপর হঠাৎ কি মনে ক'রে এমন অসময়ে এলি বল ত?

অনন্ত বেনামী চিঠিখানা কালীনাথের হাতে দিয়া বলিল—চিঠিখানা দেখাতে এসেছি তোমাকে। দেখাতে কেন, দিতেই এসেছি। চিঠিখানা তুমি রাখ—আমার শ্বশুর পাঠিয়েছেন বাবার কাছে।

কালীনাথের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। অনন্ত আর অপেক্ষা করিল না—উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু দরজা হইতে বাহির হইবার মুখেই পিছন হইতে কে ডাকিল—ঠাকুরপো!

অনন্ত পিছন ফিরিয়া দেখিল ব্রজরাণী জলখাবারের থালা হাতে তাহাকে ডাকিতেছে। অনন্তের আর যাওয়া হইল না, সে ফিরিল—বউদির হাতের খাবার তো ফেলে যাওয়া হ'তে পারে না! কি বল কালী-দা? বউদি আমার স্বর্গের দেবী—তার হাতেব জিনিষ, এ যে অমৃত!

কালীনাথ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই অনন্তের স্ত্রী একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তের পিতা চরম-পত্রই পাঠাইয়াছিলেন, সেই পত্রের ফলে আলোকপ্রাপ্ত হইয়াও বধূর পিতা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মেয়েকে পাঠাইয়া দিলেন।

ফুটবল টীম লইয়া অনন্তের সেদিন ম্যাচ দেখিতে যাইবার কথা। সকাল বেলাতেই বধূকে এমন অযাচিতভাবে আসিতে দেখিয়া মনটা তাহার উল্লাষে ভরিয়া উঠিল। সে স্থির করিল, সে আজ আর যাইবে না। কিন্তু সে-ই টীমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাফব্যাক, তাহার উপর সে-ই ক্যাপ্টেন···মনটা তাহার খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। অবশেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল খেলা শেষ হওয়ার পরেই সে ট্যাক্সি করিয়া ফিরিয়া আসিবে—ত্রিশ মাইল রাস্তা বই ত নয়! ট্যাক্সি না পাওয়া গেলে বাইসিক্ল আছে। রাত্রির অন্ধকারকে সে ভয় করে না।

সে পুলকিত চিত্তেই বাড়ীর ভিতর আপনার শয়নকক্ষে গিয়া উঠিল। বধূটি পিছন ফিরিয়া কি যেন করিতেছিল, অনন্ত সন্তর্পিত পদক্ষেপে আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। চকিত হইয়াই মুখ তুলিয়া অনন্তকে দেখিয়া সে সবলে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—ছাড়।

হাসিয়া অনন্ত বলিল—এত রাগ কেন?

—রাগ নয়; ছাড় তুমি।

—রীতিমত রাগ। কিন্তু আমি তো আবার বিয়ে করব লিখিনি। বাবা লিখেছিলেন বিয়ে দেব।

—ছাড়, বলছি—ছাড়। নইলে আমি চীৎকার করব বলছি।

অনন্ত স্ত্রীকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল—কিন্তু তোমার এমন ব্যবহার কেন?

বধূ সে-কথার কোন উত্তর দিল না, ক্রুদ্ধ নেত্রে স্বামীর মুখের দিকেই শুধু চাহিয়া রহিল। অনন্ত আবার বলিল—ওই তো কালীদাদার বউ, তার ব্যবহার দেখে এস—স্বামীকে সে কত ভক্তি—।

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বধূ বলিয়া উঠিল—কার সঙ্গে নিজেকে তুমি তুলনা করছ? শিবে আর বাঁদরে! সে বিদ্বান—

অনন্ত আর দাঁড়াইল না; হন হন করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। একেবারে আস্তাবলে গিয়া ডাকিল—নেত্য!

নিত্য সহিস কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব জুটাইয়া গোপনে চোলাই-করা মদ খাইতেছিল, অসহিষ্ণু অনন্ত একেবারে দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া বলিল—হাণ্টার কই?

হাণ্টারগাছটা লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে সে আবার ফিরিল—দেখি রে!

নিত্য বুঝিতে না পারিয়া বলিল—আজ্ঞে?

—ওই বোতলটা! বলিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া বোতলটা তুলিয়া লইয়া খানিকটা গিলিয়া ফেলিল। নির্জ্জলা হলাহল বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার মত জ্বালা ধরাইয়া দিল—মাথার মধ্যে ক্রোধ হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে আবার দ্রুতপদে অন্দরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কি বলছিলে, বল এইবার।

সে-মূর্ত্তি দেখিয়া বধূটি স্তম্ভিত হইয়া গেল—পরক্ষণে সুরার গন্ধে ক্ষোভে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল—তুমি মদ খাও? মাতাল তুমি?

—হ্যাঁ, খাই; মদ খাই, গাঁজা খাই, সব খাই। তোমার বাপের পয়সায় খাই?

আত্মবিস্মৃতা বধূ বর্দ্ধিততর ক্ষোভে বলিয়া ফেলিল—মাতাল মুখ্যু

বেরোও…। কথা তাহার অসমাপ্তই থাকিয়া গেল, হাণ্টারের আঘাতে তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। হাণ্টারের পাকান কশাখানির তীক্ষ্ণ আঘাতে বাহুমূল হইতে সমস্ত হাতখানা দীর্ঘরেখায় কাটিয়া গিয়াছে। অনন্ত হাণ্টার হাতে করিয়াই তর তর করিয়া নামিয়া গেল।

ফুটবল টীম লইয়া যাত্রার পথে ক্ষুধা অনুভব করিয়া সে আসিয়া উঠিল কালীনাথের বাড়ী—কালী-দা!

কালীনাথও বাহির হইতেছিল, সে বলিল—এই যে, আমি যে যাচ্ছিলাম তোর কাছে!

অনন্ত বলিল—সে-সব পরে শুনব। বউদি কই? বউদি?

—তোমার বউদির হুকুমেই যাচ্ছিলাম; তার ব্রত আছে, তোমায় তার ব্রাহ্মণ করেছে।

—সে হবে। কিন্তু এখন কিছু খেতে দাও তো বউদি।

ব্রজরাণী অদূরে আসিয়াই দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—সে কি, আজ তোমার বউ এসেছে—।

—আঃ বউদি, থাক না ও-কথা। এখন তুমি খেতে দেবে কিছু? বল, না তো অন্যত্র চেষ্টা দেখি। আমার সময় নেই, তোমার বাপের বাড়ীর শহরে যাচ্ছি—ম্যাচ খেলতে।

ব্রজরাণী ব্যস্ত হইয়া থালায় জলখাবার সাজাইয়া আনিয়া নামাইয়া দিল। কালীনাথ প্রশ্ন করিল—ফিরবি কবে? পরশু যে তোর বউদির ব্রত।

ক্ষুধার শান্তিতে প্রসন্নভাবেই অনন্ত বলিল—কাল সকালে। পরশুর জন্যে ভাবনা কি? কিন্তু ব্রতটা কি?

লজ্জিত হইয়া ব্রজরাণী নতমুখী হইয়া রহিল, উত্তর দিল কালীনাথ,—অবৈধব্য-ব্রত; অর্থাৎ আমার আগে মরবার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করছেন আর কি!

—বাঃ। মেয়েদের এই ধারণাটা আমার ভারি ভাল লাগে কালীদা।

তারপর ব্রজরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—বউদি, স্বর্গের দেবী তুমি!

লজ্জিতা ব্রজরাণী প্রসঙ্গান্তর আনিয়া বলিল—আমার বাপের বাড়ীতে গিয়ে কিন্তু তুমি যেন উঠো ঠাকুরপো! নইলে ঝগড়া হবে। আমারও উপকার হবে, ওঁদের খবর পাব। ক'দিন খবর পাইনি।

ম্যাচ জিতিয়াও অনন্তের মনটা ভাল ছিল না। প্রভাতের সে তিক্ত স্মৃতি তাহার মনকে অহরহ পীড়া দিতেছিল। সে অবসন্ন ভাবেই ব্রজরাণীর পিত্রালয়ের বাহিরের ঘরে নির্জ্জীবের মত শুইয়া ছিল। ব্রজরাণীর অনুরোধ-মত সে এইখানেই আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে। দলের সকলে দারুণ আপত্তি করিয়াছিল—না-না, সে হবে না ভাই। জিতলাম ম্যাচে, সমস্ত রাত আজ হৈ হৈ করব, স্ফূর্ত্তি করব। তুমি ক্যাপ্টেন—তুমি না থাকলে চলে!

সবিনয়ে হাতজোড় করিয়া অনন্ত বলিয়াছিল—সে হয় না ভাই! আমি কথা দিয়ে এসেছি বউদিকে।

—বেশ। তবে একটু খেয়ে যাও। তাহারা বোতল গ্লাস বাহির করিয়া বসিল। কিন্তু জিব কাটিয়া অনন্ত বলিল—ছি, তাই হয়? কুটুম্ব লোক!

বার-বার অনন্তর চোখ ভরিয়া জল আসিতেছিল। মনটা যেন উদাস হইয়া গিয়াছে। ব্রজরাণীর মা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—ব্রজ আমার ভাল আছে বাবা?

তাড়াতাড়ি অনন্ত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—হ্যাঁ, মাউই-মা, বউদি ভালই আছে।

—ব্রজ আমার সুখ্যাতি নিয়েছে তো বাবা? তোমাদের যত্ন-আত্তি করে তো?

উচ্ছ্বসিত হইয়া অনন্ত বলিল—এ যুগে এমন মেয়ে হয় না মাউই-মা। সতী-সাবিত্রী বইয়ে পড়েছি—বউদির মধ্যে চোখে দেখলাম!

ব্রজরাণী মা পরম তৃপ্ত হইয়া বলিলেন—বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘায়ু হও। তোমরা নিজেরা ভাল—তাই সেই দৃষ্টান্তে ব্রজ আমার ভাল হ'তে পেরেছে। অতঃপর বেয়াই-বেয়ানদের প্রণাম জানাইতে অনুরোধ জানাইয়া তিনি বিদায় লইলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি একটা বাটিতে দুধ লইয়া প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—বাবা!

অনন্তের মন তখন আপনার শ্বশুরবাড়ীর সহিত এই বাড়ীটির তুলনা করিতে ব্যস্ত ছিল, সে কোন সাড়া দিল না। ভাল লাগিল না তাহার। ব্রজরাণীর মা তাহার নিস্তব্ধতা দেখিয়া আপন মনেই বলিলেন—খেলাধূলো ক'রে নিথরে ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা।

তিনি আবার বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ীর ভিতরে হরদাস প্রশ্ন করিলেন —ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

—হাঁ! ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, আর ডাকলাম না।

—ওঃ, খুব খেলেছে ছোকরা। ভাল খেলে; স্বাস্থ্যও ভাল—বেশ ছেলে।

মা বলিলেন—ভারি মিষ্টি কথা; ব্রজের কথা বলতে একেবারে পঞ্চমুখ। ভাল বংশের ছেলে! সেই চিঠিটা কিন্তু তা হ'লে কেউ হিংসে ক'রে লিখেছিল। মাতাল, নেশাখোর, চরিত্রহীন, গোঁয়ার। দেখে তো তা মনে হয় না। তুই হাসছিস যে?

—হাসছি!

—কেন, তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

—সে-চিঠিখানা কিন্তু কালীনাথের হাতের লেখা। কালীনাথের এখনকার চিঠির লেখার সঙ্গে সে-চিঠি মিলিয়ে দেখেছি আমি। ব্রজকে ও দেখতে এসেছিল তো—খুব পছন্দ হওয়ায় এই কাণ্ড সে করেছিল।

—তা ব্রজর আমার তপস্যা ভাল। কালীনাথ আমার রূপে গুণে জামাইয়ের মত জামাই। ব্রজ বলতে পাগল।

অনন্তর মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। শেষরাত্রে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে স্থির করিল—না সে পড়াশুনাই করিবে। জীবনে প্রশংসা, শান্তি এ তাহার চাই—তাহার জন্য তপস্যার প্রয়োজন হয়, সে তপস্যাই করিবে। সর্ব্বান্তঃকরণে সে কালীনাথকে মার্জ্জনা করিল, ব্রজরাণীকে বার-বার মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিল—তুমি চিরসুখী হও, চিরায়ুষ্মতী হও।

বাড়ীতে আসিয়াই কিন্তু তাহার সব গোলমাল হইয়া গেল। দারুণ ক্রোধে তাহার পিতা বলিলেন—তোর মুখ দেখতে চাই না আমি। তুই আমাদের বংশের কলঙ্ক! তোর থেকে এত বড় বাড়ীর মান গেল, মর্য্যাদা গেল তুই মরলি না কেন?

কালই অনন্তের বধূ যে লোকের সঙ্গে আসিয়াছিল, সেই লোকের সঙ্গেই পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। অনুনয় উপরোধ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পুলিশের সাহায্য লইতে উদ্যত হইলে, এ-পক্ষ নীরবে পথ মুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বধূটি যে কটু কথাগুলি বলিয়াছে, তাহার তীক্ষ্ণতায় মর্ম্মাহত অনন্তের জননীর চোখের জল এখনও শুকায় নাই। অনন্তের সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। তবুও সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিল—আমি চললাম।

—কোথায়?

—শ্বশুরবাড়ী।

মা আর্ত্তস্বরে বলিলেন—না—না!

—ভয় নেই মা। আমি শ্বশুরের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব। সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, সেই বস্ত্রে সেই অভুক্ত অবস্থায়। মা পিছন পিছন আসিয়াও পিছন-ডাকার অমঙ্গলের ভয়ে আর ডাকিতে পারিলেন না।

শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াই সে সত্যসত্যই শ্বশুরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল। শ্বশুর মুহূর্ত্তে পা দুইটা টানিয়া লইয়া দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ তীব্র যাতনায় অস্থির

হইয়া লাফ দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—হাণ্টার উদ্যত করিয়া রক্তচক্ষু শ্বশুর। অনন্ত এবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল—হাণ্টারের আস্ফালিত রজ্জুশিখা বার বার তাহার দেহখানাকে জর্জ্জরিত করিয়া দিল, জামা ছিঁড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

—বেরোও আমার বাড়ী থেকে। বেরোও।

অনন্ত স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

হাতের হাণ্টার গাছটা ফেলিয়া দিয়া গৃহকর্ত্তা হাঁকিলেন—দারোয়ান! নিকাল দো ইস্‌কো। তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দারোয়ান আসিতে অনন্ত দ্রুতপদে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মাথার মধ্যে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠিল—সমস্ত সংকল্প ভাসিয়া গেল। সে স্থির করিল, বাড়ী হইতে রিভলবারটা লইয়া ফিরিয়া ঐ দাম্ভিক জানোয়ারটাকে হত্যা করিবে, তারপর সে নিজে আত্মহত্যা করিবে। বাড়ীর ষ্টেশনে নামিয়া দেখিল তাহাদের লোকজন পাল্কী লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। বধূ লইয়াই সে ফিরিবে, এমন প্রত্যাশাই সকলে করিয়াছিল। বাড়ীর সরকার অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—বৌমা—?

—আসেন নি।

—একি ছোটবাবু—! সর্ব্বাঙ্গে—! সরকার শিহরিয়া উঠিল।

অনন্ত দ্রুত ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া মাঠের রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

সকলের অলক্ষিতে একটা অব্যবহার্য্য সিঁড়ি দিয়া সে উপরে আসিয়া উঠিল। রিভলভারটা কোথায়? মুহূর্ত্তে অব্যবস্থিত চিত্তে তাহার খেয়াল হইল, শ্বশুরকে হত্যা করিয়া কি হইবে? কন্যার বৈধব্যের যাতনা ভোগ করিবে কে? বার-বার তাহার মন বলিল—সেই ভাল। সে আপনার পরম প্রিয় রিপীটারটা তুলিয়া লইল। খুলিয়া দেখিল কয়টা কার্ত্তুজ ভরাই আছে।

ঘরে—এই ঘরে? না, একবার কোনক্রমে ব্যর্থ হইলে তখন আর

উপায় থাকিবে না। কোন নির্জ্জন প্রান্তরে! আত্মহত্যার সঙ্কল্প লইয়া রিপীটারটা হাতে করিয়াই অলক্ষিতে সে আবার বাহির হইয়া পড়িল। বিহ্বলের মত কোন্ দিকে কোন্ পথে সে চলিয়াছিল—খেয়াল ছিল না।

—অনু! অনু!

কালীনাথের বাড়ীর জানালায় অনন্তের প্রতীক্ষায় ব্রতচারিণী ব্রজরাণী দাঁড়াইয়া ছিল। কালীনাথ জল খাইতে বসিয়াছে—জল খাইয়াই অনন্তকে সে ডাকিয়া আনিবে! ওপাশে ব্রতের আয়োজন সাজানো। ব্রজরাণীর চোখে পড়িল—অনন্ত বন্দুক-হাতে চলিয়াছে। সে বলিল—ওগো অনুঠাকুরপো পথ দিয়ে যাচ্ছে।

কালীনাথ ডাকিল—অনু—অনু!

—কে? কালীনাথ? অনন্তের মস্তিষ্কের অগ্নিশিখার উপর যেন ঘৃতাহুতি পড়িয়া গেল; সহস্র শিখায় লেলিহান হইয়া সে জ্বলিয়া উঠিল। কালীনাথ! তাহার জীবনের কুগ্রহ—তাহার সুখে পরমসুখী কালীনাথ! কালীনাথ! কালীনাথ তাহার জীবনের সাথী কালীনাথ! একা সে কোথায় যাইবে!

অনন্ত বাড়ীর মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া বলিল—এই যে!

হা-হা করিয়া হাসিয়া কালীনাথ বলিল—এসেই বন্দুক হাতে?

—কুকুর মারা মনে পড়ে? তেমনি ক'রে মারব তোমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা সে তুলিয়া ধরিল। ব্রজরাণী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কালীনাথ সভয়ে বন্দুকের নলটা চাপিয়া ধরিয়া অন্য দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—অনু, ক্ষমা—ক্ষমা!

ভীষণ গর্জনে মৃত্যু তখন হুঙ্কার দিয়াছে। কালীনাথের যে হাতখানা নলটা চাপিয়া ধরিয়াছিল সেটা ভাঙিয়া গেল। ব্রজরাণী কালীনাথকে সবলে আকর্ষণ করিয়া চীৎকার করিল—ঠাকুরপো!

আবার বন্দুকটা গর্জিয়া উঠিল, কালীনাথ পড়িয়া গেল, কিন্তু তখনও সে জীবিত। আবার! কালীনাথের রক্তাপ্লুত দেহ নিস্পন্দ নিথর!

অনন্ত দ্রুত বাহির হইয়া গ্রাম পার হইয়া প্রান্তরের পড়িল, তারপর এক স্থানে দাঁড়াইয়া বন্দুকের নলটা মুখে পুরিয়া পা দিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। খট্ করিয়া একটা আওয়াজই হইল শুধু। একি! বন্দুকটা তুলিয়া কার্ত্তুজের ঘর খুলিয়া অনন্ত দেখিল, শূন্য! নাই, আর নাই! তিনটি কার্ত্তুজই ছিল, ফুরাইয়া গিয়াছে! যাক, দড়ি তো আছে! কাপড় ছিঁড়িয়া দড়ি যে সহজেই হইবে!

পরক্ষণেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বন্দুকটা ফেলিয়া দিয়া সভয়ে সে ছুটিতে আরম্ভ করিল। মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি—ঐ যে রক্তাক্ত বিকৃতমূর্ত্তি কালীনাথ ভাঙা হাতে ফাঁসির দড়ি লইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে!

প্রাণপণে সে ছুটিল।

ধরা পড়িল সে দশদিন পর, বাংলার বাহিরে একটা দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে। সে তখন ঘোর উন্মাদ। আট বৎসর পাগলা-গারদে থাকার পর প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, দায়রা-আদালতে সেই বিচার হইতেছে। কাল ব্রজরাণীর সাক্ষ্য দিবার দিন।

আজ আট বৎসর ব্রজরাণী অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছে। তৈলহীন স্নান, আপন হাতে হবিষ্যান্ন আহার, মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া সে এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

হরদাসকে মা বলিলেন—বুঝলাম সব বাবা। এই রাত্রি তিন প্রহর হয়ে গেল; একে একে অনন্তের মা বৌ সকলে এলেন। কিন্তু উপায় কই? সে তো কথা শুনলে না। দেখে আয়, চোখ বুজে ব'সে আছে দেওয়ালে ঠেস

দিয়ে, মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে; চোখ খুলে সে তাকালে না পর্য্যন্ত। নইলে যা হবে হোক, ছেলেটার তো একটা ভবিষ্যৎ হ'ত!

বলিতে ভুলিয়াছি কালীনাথের মৃত্যুর সময় ব্রজরাণী ছিল অন্তঃসত্ত্বা। একটি পুত্র সে এই দুর্ভাগ্যের মধ্যেও পাইয়াছে।

হরদাসবাবু নিজে গিয়া ডাকিলেন—ব্রজ!

চোখ না খুলিয়াই সে উত্তর দিল—না!

—কথাটাই শোন!

মা আসিয়া বলিলেন—এইবার একটু ঘুমিয়ে নে ব্রজ!

শিহরিয়া উঠিয়া ব্রজ বলিল—না!

ঘুম'ইলেই সেই মূর্ত্তি ব্রজর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। মা বলিলেন —আমি গায়ে হাত দিয়ে থাকব রে!

—না।

আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। ব্রজরাণীর সাক্ষ্য শুনিবার জন্য আজ লোক যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ব্রজরাণী কঠিন দৃঢ় পদক্ষেপে আসিয়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিল।

সম্মুখের কাঠগড়াতেই একটি লোক—শুভ্রকেশ, শীর্ণ, ন্যুব্জদেহ, স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি, হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে ব্রজরাণীর দিকে চাহিয়া সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিতে লাগিল। উত্তর যেন অতি পরিচিত স্থানে অতি নিকটে রহিয়াছে, তবু সে খুঁজিয়া পাইতেছে না!

ব্রজরাণী স্তম্ভিত হইয়া খুঁজিতেছিল, কোথায় সে দৃপ্ত দাম্ভিক বলশালী যুবা? কই, সে কোথায়? এ কি সেই মানুষ?—না,—না, এ সে নয়, হইতে পারে না! তাহার অন্তরের মধ্যে একটা প্রবল আবেগ আসিয়া অকস্মাৎ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। চোখ দুটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ ঐ শীর্ণ জীর্ণ হতভাগ্য যেন স্মৃতিকে খুঁজিয়া পাইল—সে পরম মুগ্ধ দৃষ্টিতে গভীর শ্রদ্ধায় তাহার দিকে চাহিয়া বার-বার ঘাড় নাড়িয়া যেন নিজেকেই সমর্থন করিয়া বলিল—দেবী, দেবী! স্বর্গের দেবী! তুমি বউদি!

ব্রজরাণীর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। করুণায় মমতায় সে যেন দেবীই হইয়া উঠিয়াছে।

সরকারী উকীল ব্রজরাণীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—কেঁদে কি করবেন মা, এখন বিচার প্রার্থনা করুন। সুবিচার যাতে হয় তাতে সাহায্য করুন।

পৃথিবীর দীনতা—পুঞ্জীভূত হীনতায় জীর্ণ ঘৃণাহত ঐ হতভাগ্য, হায় রে, গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিবে। এ কি বিচার! এ কাহার বিরুদ্ধে বিচার! ব্রজরাণীর সমস্ত যেন গোলমাল হইয়া গেল!

সরকারী উকীল প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। ওদিকে জনতার মধ্য হইতে অস্ফুট গুঞ্জনে উচ্চারিত দুই-চারিটা কথা ভাসিয়া আসিতেছিল!

—ফাঁসী নয়, বন্দুকের গুলি দিয়ে মারুক ওকে।

ব্রজরাণীর চোখে আবার জল দেখা দিল! সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—সমস্ত লোক নিষ্করুণ নেত্রে আক্রোশভরে চাহিয়া আছে ঐ হতভাগ্যের দিকে। গম্ভীরমুখে জজসাহেব ইংরেজীতে কি মন্তব্য করিলেন, অর্থ না বুঝিলেও ব্রজরাণী সে শব্দের কাঠিন্য অনুভব করিল।

আদালতের পিওন বার-বার হাঁকিতেছিল—চুপ—চুপ, আস্তে—

—এই লোকটিকে দেখুন। অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে অবশ্য! এই অনন্ত কি আপনার স্বামীকে খুন করেছে? সরকারী উকীল প্রশ্ন করিলেন।

ব্রজরাণীর অন্তরাত্মা তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—তাহারই প্রতিধ্বনি জনতা স্তম্ভিত হইয়া শুনিল—না।

তারপর সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা।

ব্রজরাণী ফিরিল যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত—হৃদয়ে একটা প্রগাঢ় প্রশান্তি—হৃদয়-মন যেন কত লঘু হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে ছিলেন হরদাসবাবু। তিনি তাহাকে বলিলেন--তোর মামাশ্বশুরের সঙ্গে একবার দেখা কর্ ব্রজ। যা দিতে চেয়ে ছিলেন--চেয়ে নে! ভবিষ্যতে—

ব্রজ বলিল--না!

বাড়ীতে ব্যাপারটার সমালোচনার আর অন্ত ছিল না। ব্রজর মা পর্য্যন্ত কন্যার বুদ্ধিহীনতার সমালোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন--তুমিই একবার যাও হরদাস, ওর নাম ক'রে। সে গেল কোথায়?

সন্ধ্যার অন্ধকারে ব্রজরাণী ক্লান্ত হইয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা আসিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন--আবার এখুনি স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে একটা কাণ্ড করে বসবে। ব্রজ—ও ব্রজ! চল নীচে শুবি, এখানে তোর আবার ভয় করবে।

ব্রজ নিদ্রারক্ত চোখ মেলিয়া বলিল—না।

সে আবার নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নয়ন নিমীলিত করিল।

—শেষ—

